জুন ২০২৩ ▪ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

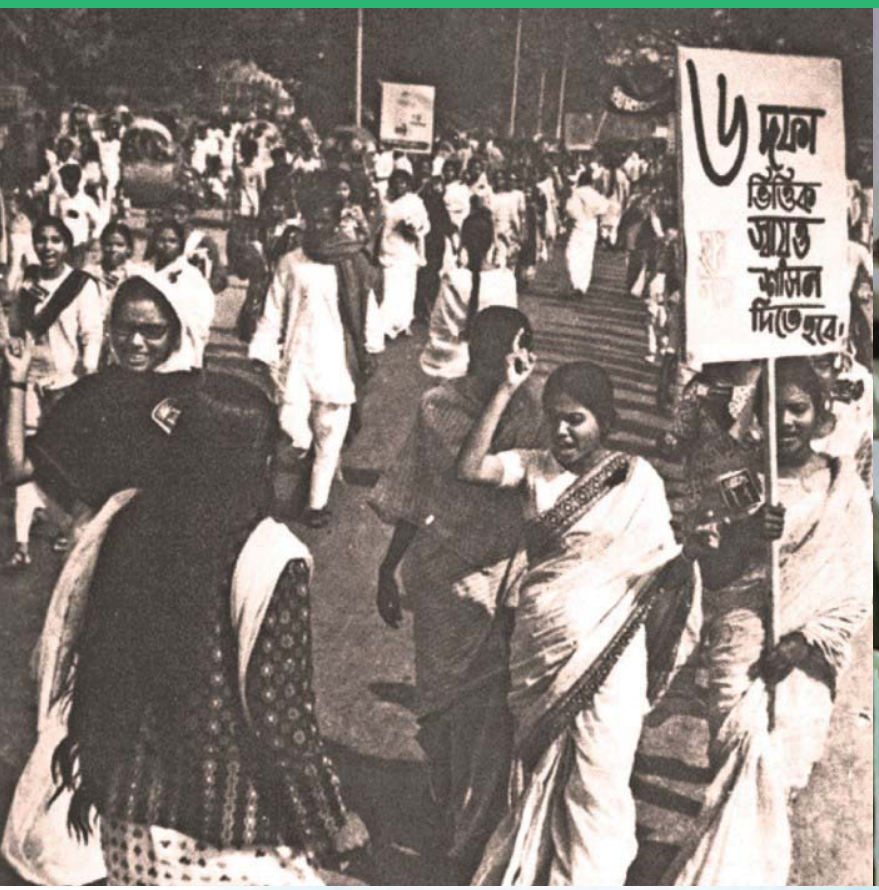

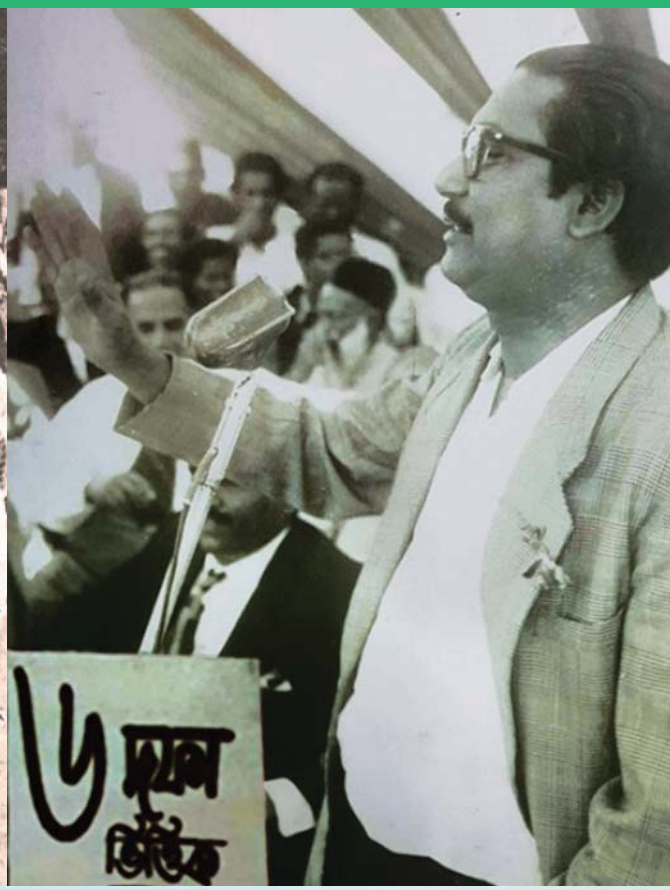

ঐতিহাসিক ছয় দফা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

কোরবানির ঈদ

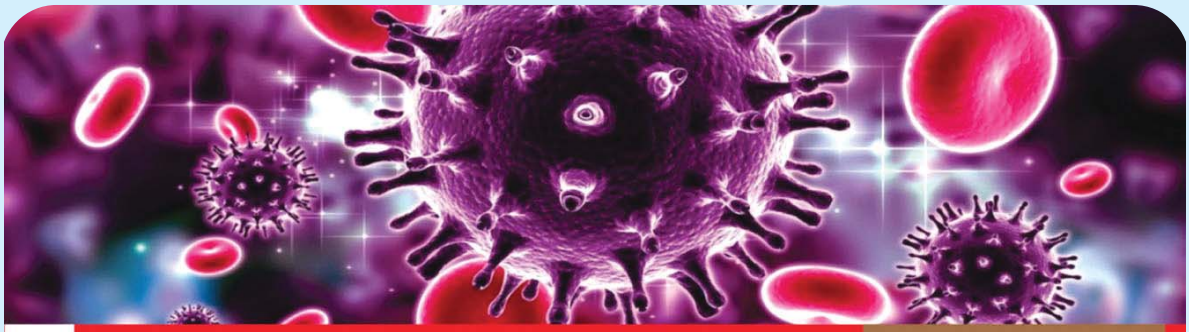

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুন ২০২৩ ❑ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩০

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই জুন ২০২৩ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দিবস' উপলক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন –পিআইডি

সম্পাদকীয়

ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস ৭ই জুন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির সভায় শেখ মুজিবুর রহমান 'ছয় দফা' প্রস্তাব করেন। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোক্তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বঙ্গবন্ধু লাহোর ত্যাগের পূর্বেই সংবাদ সম্মেলন করে ছয় দফার পক্ষে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন। এরপর তিনি ঢাকায় ফিরে এসে ছয় দফা দাবির পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ছয় দফার সমর্থনে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। এ হরতালে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণ করার জন্যই প্রতিবছর ৭ই জুন ছয় দফা দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম। ঐতিহাসিক ছয় দফা নিয়ে এবারের সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ ও গল্প।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মানব সভ্যতার বিকাশ ও অস্তিত্বের জন্য পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ জরুরি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ সুরক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

ঈদুল আজহা হলো মুসলমানদের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব। ঈদুল আজহা আসে আনন্দ ও ত্যাগের মহিমা নিয়ে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে ঈদুল আজহা মানুষকে ত্যাগের শিক্ষা দান করে। ঈদ উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ, কবিতা ও ছড়া।

জুন মাসের তৃতীয় রবিবার সারা বিশ্বে পালিত হয় বাবা দিবস। বাবা দিবস নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ের নিবন্ধ, কবিতা এবং নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর জুন ২০২৩ সংখ্যা। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

ছয় দফার পটভূমি ৪
ড. মুনতাসীর মামুন

৭ই জুনের হরতাল
ছয় দফার প্রতি প্রথম গণবিস্ফোরণ সমর্থন ৭
ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

***কারাগারের রোজনামচায়* ছয় দফা আন্দোলন** ১০
ড. মো. মাহবুবর রহমান

ছয় দফা আন্দোলনের পথপরিক্রমায়
আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা ১৫
মুহম্মদ মোহসিন রেজা

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩
সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ ১৭
দীপংকর বর

বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে প্লাস্টিক বর্জন:
আমাদের ভূমিকা ২০
মেহেদী হাসান শিশির

ছয় দফা: বাঙালির মুক্তির সনদ ২১
শামস সাইদ

কোরবানির ঈদ ২৩
মুহাম্মদ ইসমাঈল

জাতির পিতার পরিবেশপ্রেম ২৬
সাধন সরকার

সুফিয়া কামালের কবিতায় বঙ্গবন্ধু ২৮
কাজী সুফিয়া আখ্‌তার

বৃক্ষরোপণ ৩০
শওকত জাহান

পদ্মা সেতু ও রেল সড়কের পাশে
সবুজ বলয়ের মুগ্ধতা ৩৩
মোতাহার হোসেন

কবি সুফিয়া কামালের ১১২তম জন্মবার্ষিকী ৩৫
শিরিনা আক্তার

বাবা হচ্ছেন ভরসা ও ছায়ার নাম ৩৬
জুয়েল মোমিন

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস এবং বাংলাদেশ ৩৮
ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

গল্প

মুক্তির সনদ ৪০
সুজন বড়ুয়া

কবিতাগুচ্ছ ৪৪-৪৭
আবুল কালাম আজাদ, আবু তৈয়ব মুছা, দুখু বাঙাল, ওমর ফারুক নাজমুল, জাফরুল আহসান, জাহাঙ্গীর আলম জাহান, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, ইসলাম সাইফুল, আহমদ সলীম, আলমগীর কবির, এম ইব্রাহীম মিজি, মাহমুদা দিনা, বেগম শামসুন নাহার, রুস্তম আলী

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি	৪৯
প্রধানমন্ত্রী	৫০
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	৫১
শিক্ষা	৫৩
উন্নয়ন	৫৪
ডিজিটাল বাংলাদেশ	৫৫
অর্থনীতি	৫৬
নারী	৫৭
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক	৫৮
সামাজিক নিরাপত্তা	৫৯
কৃষি	৫৯
পরিবেশ ও জলবায়ু	৬০
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি	৬১
ক্রীড়া	৬২

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
চলে গেলেন কালজয়ী চিত্রনায়ক ফারুক ৬৩

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : **এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস**
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

ঐতিহাসিক ছয় দফা

ঐতিহাসিক ছয় দফা বাঙালির মুক্তিসনদ। বাঙালির দীর্ঘ আন্দোলনে রয়েছে কয়েকটি ধাপ। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন, এর ক্রমধারায় স্বাধিকারের আন্দোলন। স্বাধিকারের পথ বেয়ে স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম। ছয় দফার খসড়া বঙ্গবন্ধু হয়ত অনেককে দিয়ে করিয়েছেন, যার চূড়ান্তরূপ দেন তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে চারজন এবং তা মুজিবের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। বঙ্গবন্ধু তা গ্রহণ করেন। অন্তিমে ছয় দফা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরই। বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন এ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও একাডেমিক বিতর্ক থেকে ইনপুট নিয়ে নিজের লক্ষ্য ও ধারণা স্পষ্ট করেছেন। ছয় দফা আন্দোলনের ন্যায় এর রচনার পটভূমিও বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময়। 'ছয় দফার পটভূমি', '৭ই জুনের হরতাল: ছয় দফার প্রতি প্রথম গণবিস্ফোরণ সমর্থন', '*কারাগারের রোজনামচা*য় ছয় দফা আন্দোলন', 'ছয় দফা আন্দোলনের পথপরিক্রমায় আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা', এবং 'ছয় দফা: বাঙালির মুক্তির সনদ' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা–৪, ৭, ১০, ১৫ ও ২১

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

বর্তমান সরকার জনগণকে নির্মল বাসযোগ্য পরিবেশ উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের পানিদূষণ, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণসহ সকল প্রকার দূষণ রোধে নিরলসভাবে কাজ করছে। মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৭তম অধিবেশনে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনসাধারণকে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবার নির্ধারিত প্রতিপাদ্যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে থাকে। এ নিয়ে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩: সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ' এবং 'বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে প্লাস্টিক বর্জন: আমাদের ভূমিকা' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১৭ ও ২০

কোরবানির ঈদ

প্রতিবছর পশু কোরবানির মাধ্যমে ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ পালিত হয়। মুসলমানগণ জিলহজ মাসের দশ তারিখে ঈদগাহে একত্রিত হয়ে কোরবানির তাৎপর্যকে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় করার লক্ষ্যে একত্রে ঈদুল আজহার দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করে। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী পশু কোরবানির মাধ্যমে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে। এ নিয়ে 'কোরবানির ঈদ' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–২৩

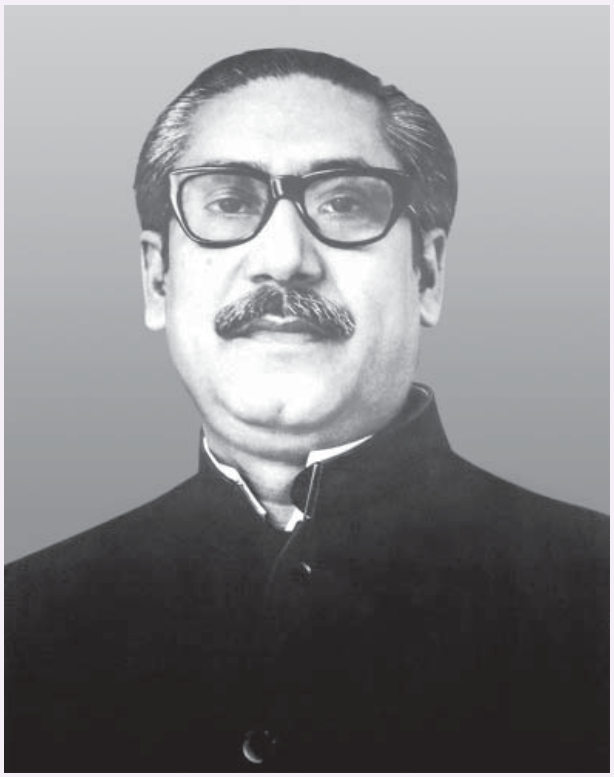

ছয় দফার পটভূমি

ড. মুনতাসীর মামুন

১৯৪০ সালে লাহোর গিয়েছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। উত্থাপন করেছিলেন লাহোর প্রস্তাব। তা গৃহীত হয়েছিল। তৃপ্তমনে ফিরেছিলেন তিনি। কিন্তু জিন্নাহ ১৯৪৬ সালে দিল্লির কনভেনশনে 'স্টেটস'কে 'স্টেট' করে দেন। এই 'এস'-এর মাহাত্ম্য বুঝতে সময় লেগেছে বাঙালির। এর ২৫ বছর পর লাহোর যাত্রা করলেন আরেক বাঙালি, শেখ মুজিবুর রহমান। সেই 'এস'-এর কথা মনে রেখেই করেছিলেন প্রস্তাব। তা প্রত্যাখ্যাত তো হলোই, বরং বিচ্ছিন্নতাবাদী উপাধি নিয়ে ব্যর্থ মনে ফিরলেন ঢাকায়।

মুজিব কি জানতেন না ছয় দফা নিয়ে কী প্রতিক্রিয়া হবে? ভালোভাবেই জানতেন। সেজন্য কারও সঙ্গেই তিনি আলাপ করেননি এ ব্যাপারে। ছয় দফার প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক হলে কী করবে আওয়ামী লীগ? ছয় দফা মনে রেখেই ১৯৬৫ সালের ২৯শে জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শেখ মুজিব বলেন, 'আওয়ামী লীগকে এখন থেকে একাই চলতে হবে। ১১ দফার ভিত্তিতেই এগিয়ে যেতে হবে।' ১৯৬৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি সম্মিলিত বিরোধী দল বা 'কপ'-এর যে সভা হয় সেখানে শেখ মুজিবের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা হয়। বলা হয়, 'আওয়ামী লীগ যে পথে যাচ্ছে তাতে কিছুদিনের মধ্যে এরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আওয়ামী লীগ ভেঙে যাবে।' এসব সমালোচনা সত্ত্বেও, লিখেছেন ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, 'মুজিব ভাই একচুলও সরে আসলেন না। সমালোচনার জবাবে বললেন, আওয়ামী লীগকে একাই চলতে হবে। তবে কেউ যদি আওয়ামী লীগের আদর্শ মেনে নিয়ে আমাদের সাথে আসতে চায়, তাহলে তাদের নিয়েই কেবল ঐক্যজোট হতে পারে।'

এভাবে দলকেও তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি।

ছয় দফার মূল নির্যাস কি নতুন কিছু ছিল? তেমন কিছু নয়। কেন্দ্রের হাতে থাকবে, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ। ১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায়ও এমনটি ছিল। ১৯৫৩ সালে যখন মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ গড়ে তুলছেন তখন অনেক সময় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছেন। ঐ বছর কাউন্সিল সভায় ভাসানী ঘোষণা করেছিলেন, 'জান দিয়ে তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়ে যাবেন এবং দলীয় প্রোগ্রামে এর গুরুত্ব দিতে হবে। কেন্দ্রের কাছে থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা।' ছয় দফায় বলা হয়েছিল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র থাকবে কেন্দ্রের হাতে। ১৯৪৯ সালে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় তখন শামসুল হকের ওপর খসড়া ম্যানিফেস্টো রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রকাশের আগে শামসুল হক প্রণীত 'মূল দাবি' বলে ১২ দফা দাবি গৃহীত হয়। এর ৩ নম্বর দাবি ছিল–

'৩. অঞ্চলগুলো লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। প্রতিরক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে থাকবে এবং অন্য সকল বিষয় ইউনিটগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।'

ম্যানিফেস্টোতে ছিল, '৬. পাকিস্তানের আঞ্চলিক ইউনিটগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে।' ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২২ দফায়ও একই কথা বলা হয়েছিল। দুই প্রদেশের বৈষম্যের বিষয়টিও একাডেমিশিয়ান ও রাজনীতিবিদদের বক্তৃতা বিবৃতিতে আলোচনায় আসছিল। সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে তা মানুষ একেবারে বোঝেননি, তা নয়। না বুঝলে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয় সম্ভব ছিল না। তারপর এক যুগে সে বৈষম্য আরও প্রবল হয়েছে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। এর উদাহরণ ছয় দফা আন্দোলনের সময় মুজিবের সভায় প্রচুর লোক সমাগম এবং আইয়ুবের উন্নয়নের দশক পালন সত্ত্বেও ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থান।

অলি আহাদ লিখেছেন, '১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধ অবসানের পরও যুক্তরাষ্ট্র সফরের মধ্যবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন এবং গভর্নর হাউসে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেই বৈঠকে আইয়ুব খানকে দেয়ার জন্য খায়রুল কবীর ইংরেজি ভাষায় রচিত ৭ দফা সম্বলিত একটি দাবিনামা নূরুল আমীনকে প্রদান করেন।' সেই কপিটি তিনি ভবিষ্যত রেফারেন্সের জন্য নিয়ে আসেন। তারপর তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে ঐ সময়ের রাজনৈতিক নেতাদের মুজিববিরোধী মনোভাব বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন, খায়রুল কবীরকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিবৃতিটি কার লেখা। তিনি বলেছেন, জনা ৫০ ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে রচনা করেছেন। 'এই কপিতে বর্ণিত ছয় দফার নিম্নাংশ ও সাত নং দফা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা।' তিনি আরও লিখেছেন, 'পরবর্তীকালে ছয় দফা আন্দোলনের ঘটনাবলিতে আমার নিকট প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, ইহার নেপথ্যে (ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (খ) আন্তর্জাতিক ইহুদী কারসাজিতো ছিলই ভারত সরকারের গোপন হস্তও ইহাতে সক্রিয়ভাবে সহায়তা প্রদান করিয়াছিল।'

অলি আহাদ আরও জানিয়েছেন, ছয় দফা নতুন কিছু নয়। ১৯৫০

সালের ৫ নভেম্বর 'ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মহা জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত সাংবিধানিক সুপারিশাবলীর অভিন্ন রূপ।'

ষাটের দশকের শুরু থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ বিশেষ করে অর্থনীতি বিভাগের, এই বৈষম্য নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা শুরু করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ২৬ বছরের তরুণ অর্থনীতিবিদ ও অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক রেহমান সোবহান ১৯৬১ সালে লাহোরে ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন -এর এক সেমিনারে দু'প্রদেশের বৈষম্য নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েন যার শিরোনাম ছিল– 'Indivisibility of the national economy of Pakistan.'

প্রবন্ধটি পরে ঢাকার *পাকিস্তান অবজারভারে* ছাপা হয়। সোবহানের দুই অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ ব্যাপক সাড়া পেল এবং সারা পাকিস্তানজুড়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এরপর এ বিষয়ে তিনি আরও কিছু প্রবন্ধ লেখেন। বাঙালি অর্থনীতিবিদদের এসব প্রবন্ধ সেই সময়কার রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রভাব ফেলে। এবং বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা নির্মাণে সহায়তা করে। তাঁর ভাষায়–

'... two economics which were lodged within the body politic of then the Pakistan state and the economic deprivation of the Banglis, which originated in this peculiar national construct. These writings of mine on the economy, along with those of other Bangali economists, were influential in shaping the political debates of the time which culminated in pesentation of the 6 point agenda by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, which became then *Magna cartra* for the struggle for self rule for Bangladesh.'

পরবর্তীকালে [১৯৭০-৭১] ছয় দফার ভিত্তিতে কীভাবে সংবিধান রচিত হতে পারে তা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গোপন আলোচনা শুরু হয়। দলের সিনিয়র কিছু নেতা ও অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম, তরুণ রেহমান সোবহান ও কামাল হোসেনকে এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নুরুল ইসলাম লিখেছেন, এসব আলোচনার সময় খোন্দকার মোশতাককে কখনও স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায়নি। খসড়া সংবিধান রচিত হলে খোন্দকার মোশতাক পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকায় তা ফাঁস করে দেন। বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কারণ, বঙ্গবন্ধুর স্ট্র্যাটেজি শত্রুরা জানলে তারা সেভাবে ব্যবস্থা নেবে। কামাল হোসেন, নুরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহান বঙ্গবন্ধুকে তা জানান। তিনি বলেছিলেন ব্যাপারটি দেখবেন। দুই অর্থনীতি ও ছয় দফা রচনার পটভূমি হিসেবে এ ধরনের আরও আলোচনা তাঁর গ্রন্থে আছে।

রাজনৈতিক নেতারা ছয় দফার এই বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলি উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন। বরং বিষোদগারে মুখর থাকেন। সিরাজুল আলম খান বলেছেন, ছয় দফার বিষয়টি জানার পর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর নিয়ত আলাপ হতো। একদিন "তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন, ছয় দফার ওপর একটি সেমিনার করলে কেমন হয়। 'তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের এই নপুংসক বুদ্ধিজীবীরা ছয় দফার কী বুঝবে রে?' আর যদি সেমিনার করতে দেই, যদি না বুঝেই বিরোধিতা করে বসে, তাহলে তো উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি।"

তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন, "আমাদের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে' এই বুদ্ধিজীবীদের কী ভূমিকা ছিল তা এখন আমরা সবাই জানি। যে ন্যাক্কারজনক, লজ্জাকর ও নেতিবাচক ভূমিকা তারা রেখেছে, মুজিব ভাইয়ের সেদিনকার কথায় আমি তার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম। তখনকার শিল্পী সাহিত্যিকদের ব্যাপারেও একই কথা। ছয় দফা ও ১১ দফা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দু'একজন শিল্পী বাদে আর কাউকে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রামে সামিল করাতে পারিনি।"

নিজের দেশের মনন সংস্কৃতি সম্পর্কে বিশাল অজ্ঞতা ছাড়া এ ধরনের মন্তব্য করা যায় না। তাঁর আত্মজীবনীতে এ ভাবটি স্পষ্ট যে ছাত্রলীগ গড়ায়, ছয় দফা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করায় তাঁর ভূমিকা ছিল। নার্সিসাস ছাড়া কারও পক্ষে এরকম ভাবা সম্ভব নয়। জীবনের শুরু থেকেই শিল্পী সাহিত্যিকদের বা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সম্পর্ক ছিল। সিরাজুল আলম খানই আবার লিখেছেন ছয় দফা রচনায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল। ১৯৫৩ সালের

ছয় দফা দাবি পেশের পর তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে সাথে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান লাহোর থেকে ফিরছেন

১৯৬৬ সালের ৭ই জুন পূর্ব পাকিস্তানে ছয় দফা আন্দোলনের পক্ষে একটি সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়

কাউন্সিলে সাংগঠনিক রিপোর্টে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের গভীর বাস্তবতাবোধই একদিন আওয়ামী লীগকে জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন করিয়া তুলিয়াছিল। ... বর্তমান অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ছাড়াছাড়িতে ফ্রান্সের কনভেনশনিস্টদের মতো অবস্থা যেন আমাদের না হয়...।'

ছয় দফা কারও একক রচনা নয়। ১৯৪৯ সাল থেকেই যে ভাবনা অনুচ্চারিত ছিল বিভিন্ন সময় তা আলোচনায় আসতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ। সে পথে যাবার জন্যে ছয় দফা ছিল একটি মাধ্যম বা কৌশল। তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা বিভিন্ন ফোরামে গোপনে বা প্রকাশ্যে আলোচনা করেন। বিষয়টি কী সে বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল। তবে তা কাগজে-কলমে স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে আসা প্রয়োজন ছিল। এ কারণে স্বায়ত্তশাসনের নির্যাস কাগজে-কলমে রূপ দেওয়ার জন্য তাঁর তিন বন্ধু রুহুল কুদ্দুস, আহমদ ফজলুর রহমান ও আতাউর রহমানের সবচেয়ে ছোটো ভাই শামসুর রহমানকে ভার দেন। রুহুল কুদ্দুস ও ফজলুর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম ব্যাচের [১৯৪৯] সিএসপি। শামসুর রহমান তার কিছুটা পরের। ১৯৬২ সালে বঙ্গবন্ধুর আগরতলা যাওয়ার ব্যাপারটা সমন্বয় করেছিলেন রুহুল কুদ্দুসই। এবং ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলায় বঙ্গবন্ধুসহ এই তিনজনকেই আসামি করা হয়েছিল। সুতরাং সহকর্মীদের চেয়ে পেশাজীবী বা বুদ্ধিজীবীদের ওপর তাঁর আস্থা কম ছিল এটা দূরকল্পনা। তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে শুধু তাজউদ্দীন আহমদকে এর সঙ্গে যুক্ত করেন। সিরাজুল আলম লিখেছেন, 'শেখ মুজিবের সম্মতিক্রমেই এই ছয় দফা প্রণয়নের কাজটি শুরু হয়। তিনিই তাজউদ্দীন ভাইয়ের এ কাজে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকার ব্যবস্থা করেন। উপরিউক্ত সিএসপি কর্মকর্তাদেরও তাজউদ্দীনের এই অন্তর্ভুক্তির কথা জানানো হয়। আরও দুজনের অন্তর্ভুক্তির কথা শুনেছি। কিন্তু তাঁরা কারা জানতে পারিনি। মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার আলাপ হলেও তিনি আমাকে এই তিনজনের বাইরে আর কারও নাম বলেননি। ছয় দফা প্রণয়নকারীরা শুধু যে উচ্চশিক্ষিতই ছিলেন তা নয় জ্ঞান ও মেধার দিক থেকেও অনেক উপরের স্তরের মানুষ ছিলেন তাঁরা। ছয় দফা প্রণয়নকালে মুজিব ভাইয়ের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্যের কথা তাঁদের মাথায় ছিল।'

ছয় দফার খসড়া বঙ্গবন্ধু হয়ত অনেককে দিয়ে করিয়েছেন যার চূড়ান্তরূপ দেন এই চারজন এবং তা মুজিবের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। তিনি তা গ্রহণ করেন। অন্তিমে ছয় দফা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেরই। তিনি দীর্ঘদিন এ বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও একাডেমিক বিতর্ক থেকে ইনপুট নিয়ে নিজের লক্ষ্য ও ধারণা স্পষ্ট করেছেন এবং তার লিখিত রূপ প্রদানের জন্য এঁদের ওপরই নির্ভর করেছেন।

ড. মুনতাসীর মামুন: সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক

৭ই জুনের হরতাল

ছয় দফার প্রতি প্রথম গণবিস্ফোরণ সমর্থন

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

৭ই জুন বাংলাদেশের ইতিহাসে ছয় দফার দাবি দিবস হিসেবে ১৯৬৭ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে। পাকিস্তান আমলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ৭ই জুন সীমিত পরিসরে হলেও যে কর্মসূচির আয়োজন করত তাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। পাকিস্তানের দমন-নিপীড়নবিরোধী, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সমর্থন এবং কোথাও কোথাও অংশগ্রহণও ছিল। ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে ছয় দফার বিষয়টি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আলোচিত ছিল, ৭ই জুনের যে-কোনো কর্মসূচির প্রতি তাদের সমর্থন গোপনীয় ব্যাপার ছিল না। ১৯৭২ সাল থেকে ৭ই জুন তারিখে রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হতো তাতে বঙ্গবন্ধুসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকতেন, ভাষণ দিতেন, লক্ষ লক্ষ জনতা শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা ছিলেন, তারা ৭ই জুন পালন করার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিষয়টিকে তারা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবেই দেখেছেন। সেই দলগুলো এখনও জাতীয় ইতিহাসে এই দিনটির মতো আরও বেশ কিছু দিনের প্রতি কোনো ধরনের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মনোভাব দেখায় না, কর্মসূচিও নিয়ে থাকে না। ফলে ৭ই জুন তাদের অংশগ্রহণ ব্যতীতই দেশে পালিত হয়ে থাকে। অথচ তাদের অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী দল হিসেবে নিজেদের দাবি করে থাকে। কিন্তু ৭ই জুন এমনকি ছয় দফা সম্পর্কেও তারা কোনো ধরনের উচ্চবাচ্য করে না, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অত্যাবশ্যকীয় অধ্যায় হিসেবে মুখে উচ্চারণ করে না। জাতীয় ইতিহাসের এমন বাঁক পরিবর্তনের ঘটনাকে বাদ দিয়ে যারা রাজনীতি, দেশ পরিচালনা এবং স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের দাবিদার বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে তারা ইতিহাসকে খণ্ডিত, পাকিস্তানি ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার এবং সেভাবেই জাতীয় জীবনে এর অবস্থানকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে থাকে। ছয় দফার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে অভিহিত করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গণমানুষকে সম্পৃক্ত করার আন্দোলন ধাপে ধাপে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ইতিহাসের মহাস্রোতে পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পূর্ব বাংলা থেকে ভাসিয়ে নিয়েছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই পর্বের নেতা, রাজনৈতিক দল এবং এর ইতিহাসকে অস্বীকার করার প্রবণতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে তখনও এবং এখনও অনেক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এটি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। অথচ ছয় দফা দেওয়া না হলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ জেগে ওঠার কোনো কারণ বা ব্যাখ্যা খুঁজে পেত না, ৭ই জুনের মতো রক্তাক্ত ও আত্মত্যাগের অধ্যায় সৃষ্টি হতো না, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তৈরি হতো না। ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়মকে অস্বীকার করে অনেকেই রাজনীতি করেন, ইতিহাসের কথাও বলেন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিদার সাজার চেষ্টা করেন। এমন আপাতবিরোধী দ্বিচারি চরিত্র আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে। এটি উন্নত ও সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সচরাচর দেখা যায় না। জাতীয় ইতিহাসের ঘটনাবলিকে দলমতনির্বিশেষে সবাই স্বীকার করেন, গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোকে উদ্‌যাপন করেন এবং সেই স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী নেতৃবৃন্দকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণও করে থাকেন। কিন্তু আমাদের এখানে সেই সম্মানবোধ আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সবাই অকৃত্রিমভাবে প্রদর্শন করতে পারিনি। একটি বড়ো ধরনের বিভাজন রেখা জাতীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়ে টানা হয়েছে। সে কারণেই স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি এবং বিপক্ষ শক্তির কথা বলা হলে মোটেও ভুল কিছু বলা হয় না।

১৯৬৬ সালের ৭ই জুন তারিখে ছয় দফার সমর্থনে সারা দেশ অভূতপূর্ব এক হরতাল পালিত হয়েছিল। সেই হরতাল আহ্বান করেছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। কারণ ঐ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা প্রদান করার পর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুসহ দলীয় নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিহিত করেছিল। মার্চ মাসের ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে 'আমাদের বাঁচার দাবি' শিরোনামে ছয় দফা দলীয়ভাবে গৃহীত হয়। এর ফলে জনমত সৃষ্টির জন্য সমগ্র প্রদেশে সরকারি বাধানিষেধ উপেক্ষা করে একের পর এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বঙ্গবন্ধুসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ছয় দফার যৌক্তিকতা দফাওয়ারি ব্যাখ্যা করে জনগণকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। দ্রুত তাঁর এই জনসফরগুলো জনসমুদ্রে পরিণত হতে থাকে। তিনি ১৯৪৭- পরবর্তী সময়ের পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে একজন লড়াকু রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকেন, বার বার জেলে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন অদম্য স্পৃহার এক ব্যতিক্রমধর্মী সাহসী রাজনীতিবিদ, যিনি ৫০ আর ৬০-এর দশকের শুরুতে জেলের বাইরে থাকার দিনগুলোতে গ্রামগঞ্জে চষে বেড়িয়েছিলেন মানুষের দাবি আদায়ের জন্য। সুতরাং শেখ মুজিব তখন মানুষের কাছে একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতার নাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। তাঁকে দেখতে ও কথা শোনার জন্য ছয় দফা প্রদানের পর তাঁর জনসভায় মানুষ দলে দলে যোগদান করতে থাকেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে ছয় দফা পেশ করেন

এমনকি রেলগাড়ি থামিয়ে রেলস্টেশনগুলোতেও জনতা তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য ১৯৬৬ সালে বহু অনির্ধারিত সমাবেশ ঘটতে দেখা গেছে। আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবের এই জনপ্রিয়তা এবং ছয় দফার প্রতি জনসমর্থন দেখে তা রুদ্ধ করার জন্য স্বৈরাচারী পন্থায় অগ্রসর হয়েছিল। ৮ই মে নারায়ণগঞ্জের টাউন হল ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। উক্ত জনসভায় নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ তাঁকে তখনকার ৫ কোটি নয় ১০ কোটি মানুষের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁকে নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ছয় দফায় খোদিত একটি স্বর্ণতারকা, আদমজীর শ্রমিকদের পক্ষ থেকে পাটের তৈরি মালা, বস্ত্রশ্রমিক, পাট ব্যবসায়ী এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মাল্য প্রদান করা হয়। ছয় দফার জনসভায় ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু ছয় দফার প্রতিটি দাবি এক এক করে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পর হইতে নতুনভাবে আমার বিরুদ্ধে একটার পর একটা মামলা দায়ের করা হইতেছে। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের জানিয়া রাখা দরকার যে, কোনো কিছুতেই আমাদের ছয় দফা দাবি আদায়ের প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত করা যাইবে না।' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ই মে ১৯৬৬) এই জনসভায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ দেখে পাকিস্তান সরকারের বুঝতে বাকি থাকেনি যে, পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে শেখ মুজিব এবং ছয় দফা কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তান সরকার এই জনপ্রিয়তাকে আর বাড়তে দিতে চায়নি। বঙ্গবন্ধুসহ নেতৃবৃন্দ ঢাকায় রাতে ফিরে আসেন। ৯ই মের প্রথম প্রহর থেকেই বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার শুরু করা হয়। ৯ই মে থেকে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য সকল নেতাকেই কারারুদ্ধ করা হতে থাকে। আওয়ামী লীগ যেন কোনো ধরনের প্রতিবাদ বা কর্মসূচি দিতে না পারে সে ধরনের কঠোর অবস্থানে আইয়ুব সরকার ছিল। কিন্তু ১০ তারিখেই আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিল হয়। ১৩ তারিখ পল্টন ময়দানে অবিলম্বে কারাবন্দি নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে নেতাকর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে জনসভার আয়োজন করে এবং তাতে ভয়ভীতি উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ অংশ নেয়। ২০শে মে আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক সভা ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কারাবন্দি নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, সংবাদপত্রের ওপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২৭শে মে রাওয়ালপিন্ডিতে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটি ৭ই জুন আহূত হরতালকে সমর্থন জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করে। ৩১শে মে ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ থেকে হরতাল সফল করার আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি কমিটির হরতালের প্রতি সমর্থনের বিষয়টি পত্রপত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়। সেই সময় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ৭ই জুন আহূত হরতালের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ করার সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই প্রথম শ্রমিক সংগঠনগুলোকে হরতাল সফল করার জন্য সংগঠিত করার গোপন উদ্যোগ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। ৭ই জুনের হরতালকে বানচাল করার জন্য সরকার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ধরপাকড় বৃদ্ধি করে। ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে এদেরকে পাঠানো হয়। বঙ্গবন্ধুর *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কারাগারে বন্দিরত বঙ্গবন্ধু ৭ই জুনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ৬ই জুন তিনি জেলে বসে *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে লেখেন, আগামীকাল ধর্মঘট। পূর্ব বাংলার জনগণকে আমি জানি, হরতাল তারা করবে। রাজবন্দিদের মুক্তি তারা চাইবে। ছয় দফা সমর্থন করবে। তবে মোনায়েম খান যেভাবে উস্কানি দিতেছেন তাতে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা যে তিনি করছেন, এটা বুঝতে পারছি। জনসমর্থন যে তার সরকারের নাই তা তিনি বুঝেও, বোঝেন না।...ধরপাকড় চলছে সমানে। কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে। যশোর আওয়ামী লীগ অফিস তল্লাশি করেছে। ভূতপূর্ব মন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মশিয়ুর রহমান প্রতিবাদ করেছেন। জনাব নুরুল আমীন সাহেব আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তারের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং মুক্তি দাবি করেছেন। (পৃ. ৬৭-৬৮)

পূর্ব ঘোষিত ৭ই জুনের হরতাল প্রদেশব্যাপী পালিত হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ প্রদেশের শিল্পাঞ্চলগুলোতে শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে এতে অংশগ্রহণ করে। ব্যাপক সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন স্থাপনা, যানবাহন ইত্যাদি ঘেরাও করে। মানুষের তীব্র ক্ষোভ পুলিশের দিকেও বর্ষিত হয়। পুলিশ গুলি চালিয়ে সেটি দমনের চেষ্টা করে। এতে ১১ জন মানুষ নিহত হন। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক মুন্নু মিয়ার নাম মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। স্বাধীনতার পর তাঁর নামে তেজগাঁও মুন্নু মিয়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি বর্তমানে একটি সরকারি স্কুল। ৭ই জুনের হরতালের সংবাদ পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। তবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাঙালি

কয়েকজন কর্মকর্তার বিশেষ চেষ্টায় একটি প্রেস রিলিজ রাতের বেলায় পত্রিকাগুলোর হাতে পৌঁছানো হয়। তাতে ১১ জনের নিহত হওয়ার ছোট্ট একটি সংবাদ ছিল যা ৮ তারিখ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি পরবর্তী সবচেয়ে বড়ো হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করার পেছনে মোনায়েম সরকার এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্টতা ছিল। তবে ছয় দফার প্রতি এমন রক্তস্নাত সমর্থন পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক বিস্ফোরণের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। ৮ই জুন জেলখানায় বসে বঙ্গবন্ধু ৭ই জুন হরতালে পুলিশের নির্বিচারে গুলিতে আহত ও নিহতদের প্রতি তাঁর সমবেদনা জানিয়ে তাঁর *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় লেখেন, 'ছয় দফা যে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি। পশ্চিমা উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষকশ্রেণি যে আর পূর্ব বাংলায় নির্যাতিত গরীব জনসাধারণকে শোষণ বেশিদিন করতে পারবে না সেকথা এবার জেলে এসেই বুঝতে পেরেছি। বিশেষ করে ৭ই জুনের যে প্রতিবাদে বাংলার গ্রামগঞ্জে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়েছে, কোনো শাসকের চক্ষু রাঙ্গানি তাদের দমাতে পারবে না। পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য শাসকশ্রেণির ছয় দফা মেনে নিয়ে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করা উচিত।'

৮ই জুন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বেশ কয়েকজন নেতা এক মুক্ত বিবৃতিতে এই হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তারা পাকিস্তানের দমন-নিপীড়নের প্রতিবাদ ও স্বায়ত্তশাসনের যৌক্তিকতার প্রতি সমর্থন জানান। কয়েকজন নেতৃবৃন্দ একটি ঐক্যজোটও গঠন করার উদ্যোগ নেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, ৭ই জুনের হরতালের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণের মধ্যে ছয় দফার প্রতি সমর্থন এবং আইয়ুব ও মোনায়েম সরকারের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা বাড়িয়ে দেওয়ার অবস্থানে চলে যায়। আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে যে-কোনো মূল্যে বাস্তবায়ন করার জন্য সংকল্পবদ্ধ– সেটি জনগণের কাছে যেমন পরিষ্কার হয়ে যায়, পাকিস্তানের সরকারও ধারণা করতে কিছুটা সক্ষম হয় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ এই হত্যাকাণ্ডকে যেমন ক্ষোভের সঙ্গে দেখেছে, পাকিস্তানের প্রতিও তাদের আস্থায় চির ধরার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

এরপর পাকিস্তান সরকার আরও দমন-নিপীড়ন বাড়িয়ে দেয় এবং আওয়ামী লীগকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, জামায়াত ইসলাম এবং পূর্ব পাকিস্তানের ঐসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি জোট গঠন করে যার নাম ছিল– পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট সংক্ষেপে পিডিএম। পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে বাঙালি সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসংগীতবিরোধী প্রচারণা এবং নিষিদ্ধকরণও চলতে থাকে। কিন্তু ৭ই জুনের হরতালের পরে পাকিস্তান যত বেশি বাঙালি এবং পূর্ব বাংলাবিরোধী আচরণ করতে থাকে, জনগণ তত বেশি ছয় দফার প্রতি সমর্থন এবং শেখ মুজিবসহ কারাগারে বন্দি নেতাদের মুক্তির দাবিতে মানসিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ৭ই জুনের হরতাল শ্রমিক ও নাম না জানা মানুষদের আত্মদানের একটি গৌরবময় ঐতিহাসিক দিন, যার ওপর ভিত্তি করে ছয় দফার আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবি, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ২২শে ফেব্রুয়ারি তাঁর মুক্তি নিশ্চিত করে। ২৩ তারিখ শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' নামে ভূষিত করা হয়। পাকিস্তানের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। পাকিস্তানের রাজনীতি তখন পশ্চিম থেকে পূর্ব বাংলায় মোড় নেয়। বঙ্গবন্ধু রাজনীতির কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। এসবই ছয় দফা আন্দোলনের নানা পর্বের নানা ঘটনা ও জনসম্পৃক্ততায় বেড়ে ওঠা ইতিহাস, যেখানে ৭ই জুনের হরতাল রক্তে ভেজা আন্দোলনের এক নতুন পর্ব সৃষ্টি করেছিল।

ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী: ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলো, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইতিহাস, বাউবি, patwari54@yahoo.com

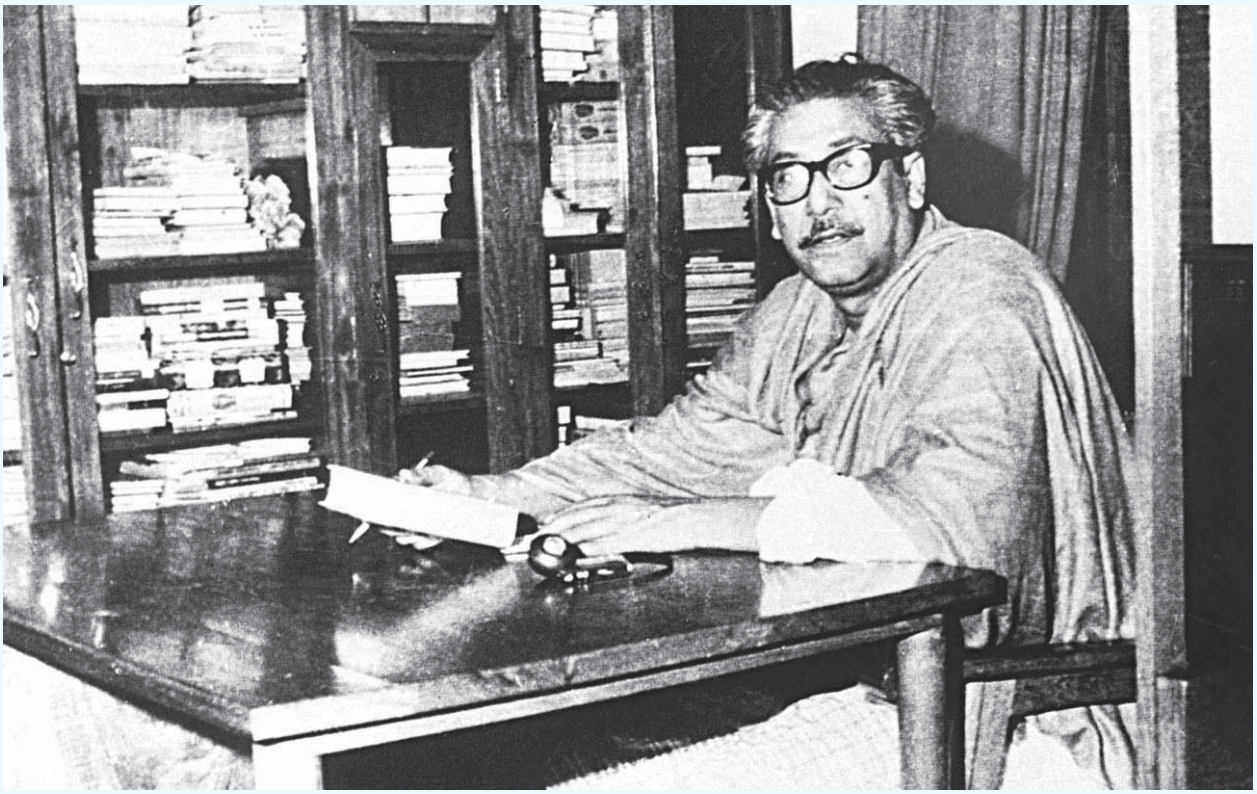

কারাগারের রোজনামচায় ছয় দফা আন্দোলন

ড. মো. মাহবুবর রহমান

বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় বসে ২রা জুন ১৯৬৬ থেকে ২২শে জুন ১৯৬৭ পর্যন্ত যে ডায়েরি লিখেছিলেন তারই প্রকাশিত রূপ *কারাগারের রোজনামচা* নামক গ্রন্থ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৭)। জেলখানায় বসে ডায়েরি লিখতে বঙ্গবন্ধুকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব। ডায়েরি লেখার সময় জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাতাও সরবরাহ করেছিলেন বেগম মুজিব। সেরকম তিনটি খাতা পাওয়া যায়। প্রথম খাতাটি ১৯৬৬ সালে লেখা এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬৭ সালে। তৃতীয় খাতাটির নাম বঙ্গবন্ধু নিজেই দিয়েছিলেন: 'থালা বাটি কম্বল/জেলখানার সম্বল'। ঐ ৩টি খাতার সমন্বয়ে *কারাগারের রোজনামচা* প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (২৫শে জানুয়ারি, ২০১৭)। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: 'বর্তমান বইটির নাম ছোটো বোন রেহানা রেখেছে– *কারাগারের রোজনামচা*। 'এতটা বছর বুকে আগলে রেখেছি যে অমূল্য সম্পদ– আজ তা তুলে দিলাম বাংলার জনগণের হাতে'। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পাদক লিখেছেন:

> ৬ দফা দাবি পেশ করে যে প্রচার কাজ তিনি শুরু করেছিলেন সেই সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
>
> তাঁর গ্রেফতারের পর তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পত্র-পত্রিকার অবস্থা, শাসকদের নির্যাতন, ৬ দফা বাদ দিয়ে মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। মানুষের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ও সংগ্রাম তিনি করেছেন যার আন্তর্নিহিত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা অর্জন।
>
> বাংলার মানুষ যে স্বাধীন হবে এ আত্মবিশ্বাস বার বার তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো নেতা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন কি না আমি জানি না (পৃ.১৩)।

১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত আইয়ুব খান কর্তৃক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধীদলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে তা নাকচ করা হলে তার প্রতিবাদে শেখ মুজিব তার ছোটো প্রতিনিধিদল (৭৪০ জনের মধ্যে ৫ জন) নিয়ে সম্মেলনস্থল ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ছয় দফার বিষয়টি ৭ই ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্তাকারে ছাপা হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব তাঁর দলের ছয় দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। ওয়ার্কিং কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা-কর্মসূচি' শীর্ষক এক পুস্তিকা বিলি করা হয়। পাশাপাশি দলের তরুণ কর্মীরা 'বাঙালির দাবি ৬ দফা', 'বাঁচার দাবি ৬ দফা', '৬ দফার ভিতরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিহিত' ইত্যাদি স্লোগান সংবলিত পোস্টারে পোস্টারে দেয়াল ছেয়ে ফেলেন। বঙ্গবন্ধু জনমত গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী প্রথম সভা ঢাকার শ্রীপুরে, দ্বিতীয় সভা মানিকগঞ্জে (সভা দুটির তারিখ জানা যায়নি), ২০শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামস্থ লালদিঘি ময়দানে,

২৬শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে আয়োজিত আওয়ামী লীগ কর্মীসভায়, ২৭শে ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীর মাইজদী কোর্টে আওয়ামী লীগের বার্ষিক সম্মেলনে, ২রা মার্চে নারায়ণগঞ্জে জনসভায়, ৫ই মার্চ ঢাকা দক্ষিণ, ১০ই মার্চ মুক্তাগাছায়, ১৫ই মার্চ সিলেটে জনসভায়, ১৬ই মার্চ ঢাকা বারে আওয়ামী লীগের ডেলিগেট সভায় বক্তৃতা করেন। এভাবে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত ১৫টি সভায় তিনি ছয় দফার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। ইতোমধ্যে ১৩ই মার্চ আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদন করে নেন। এরপর তিনি ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ 'সারা দেশ জুড়ে ছয় দফার প্রচার শুরু করেন। ২০শে মার্চ থেকে ৮ই মে পর্যন্ত ৫০ দিনে তিনি ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন। ছয় দফার প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮ই মে ১৯৬৬ শেখ মুজিব দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পূর্বেই তিনি ছয় দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সরকারও বসে থাকেনি। আইয়ুব-মোনায়েম চক্র আতঙ্কিত হয় ও জেল-জুলুম শুরু করে।

জেলে বসেই বঙ্গবন্ধু ছয় দফার গুরুত্ব ও এর প্রচার, বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পত্রপত্রিকার ভূমিকা, ছয় দফার পক্ষে আন্দোলনকারীদের বন্দিদশা প্রভৃতি বিষয় ডায়েরিতে লিখেছেন। এখানে তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

ছয় দফা প্রসঙ্গ

বঙ্গবন্ধু ছয় দফা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'ছয় দফা জনগণের দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচা-মরার দাবি। এটাকে জোর করে দাবানো যাবে না। দেশের অমঙ্গল করা হবে একে চাপা দেবার চেষ্টা করলে... কলোনি বা বাজার হিসেবে বাস করতে চাই না। নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার চাই' (২.৭.১৯৬৬)। তিনি লিখেছেন, '৬ দফা দাবি পেশ করার সাথে সাথে দুনিয়া জানতে পেরেছে বাঙালিদের আঘাত কোথায়? বাঙালিদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা এমনকি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুই নাই। ১৯ বৎসর পর্যন্ত চলেছে শোষণ আর লুণ্ঠন' (১৪.০৬.১৯৬৬)। বঙ্গবন্ধু জেলে আটক থাকা অবস্থায় কিছু রাজনৈতিক নেতা আইয়ুববিরোধী জোট গঠন করার উদ্যোগ নিলে বঙ্গবন্ধু তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে লেখেন, '৬ দফা বাদ দিয়া কোনো দলের সাথে আওয়ামী লীগ হাত মেলাতে পারে না। আর করবেও না। আওয়ামী লীগ সংগ্রামী দল, সংগ্রাম করে যাবে।... (২০.০৭.১৯৬৬)

ছয় দফা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

১৪ই জুন (১৯৬৬) তারিখে বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উচিত ৬ দফা দাবি মেনে নেওয়া। তা না হলে পরিণতি ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন, 'বাঙালির একটা গোঁ আছে, যে জিনিস একবার বুঝতে পারে তার জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণও করতে পারে।' *ছাত্রলীগের প্রতি আস্থা রেখে* বঙ্গবন্ধু লেখেন, '... প্রত্যেকটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন, রাজবন্দিদের মুক্তি আন্দোলন, ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ও ছাত্রদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে বহু জেল-জুলুম সহ্য করেছে এই কর্মীরা। পূর্ব বাংলার ছয় দফার আন্দোলন ও আওয়ামী লীগের পুরোভাগে থেকে আন্দোলন চালিয়েছে ছাত্রলীগ। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গোলমাল হলে আমার বুকে খুব আঘাত লাগে'... (১৮ই মার্চ, ১৯৬৭)।

আওয়ামী লীগের কর্মীদের ত্যাগ স্বীকার করে বঙ্গবন্ধু লেখেন, 'আওয়ামী লীগ কর্মীদের গ্রেপ্তার করে চলেছে। ...দমননীতি সমানে চালাইয়া যেতেছে সরকার... আওয়ামী লীগ কর্মীরা যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করেছে। ছয় দফা দাবি যখন তারা দেশের কাছে পেশ করেছে তখনই প্রস্তুত হয়ে গিয়াছে যে তাদের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। এটা ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নয়, জনগণকে শোষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সংগ্রাম। যথেষ্ট নির্যাতনের পরেও আওয়ামী লীগ কর্মীরা দেশের আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নাই (৫.৬.১৯৬৬)।

নেতারা তখন জেলে। নেতাদের অনুপস্থিতি আওয়ামী লীগের কর্মীরা যে আন্দোলন চালাইয়া যাবার যোগ্যতা রাখে সে বিশ্বাস ও আস্থা বঙ্গবন্ধুর ছিল। তিনি লিখেছেন, 'এখন একমাত্র চিন্তা কর্মীরা নেতা ছাড়া আন্দোলন চালাইয়া যেতে সক্ষম হবে কি না। আমার বিশ্বাস আছে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নিঃস্বার্থ কর্মীরা, তাদের সাথে আছে। কিছু সংখ্যক শ্রমিক নেতা– যারা সত্যই শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন করে– তারাও নিশ্চয়ই সক্রিয় সমর্থন দেবে। এত গ্রেপ্তার করেও এদের দমাইয়া দিতে পারে নাই (৫ই জুন ১৯৬৬)।

বঙ্গবন্ধু জেলে বসেই ছয় দফা আন্দোলনের খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। যারা নতুন আটক হয়ে আসতেন এবং বিশেষ করে কারারক্ষীরা তাঁর খবর সংগ্রহের উৎস ছিল। জেলখানায় তিনি দৈনিক পত্রিকা পেতেন। তাঁকে পত্রিকা সরবরাহ করার পূর্বে স্পর্শকাতর সংবাদ বা ফিচার কালি লেপন করে দেওয়া হতো। তার পরও তিনি সমসাময়িক দেশ-বিদেশের খবর পেয়ে যেতেন। আওয়ামী লীগের এম.এন.এ. গণ (জাতীয় পরিষদের সদস্য) পার্লামেন্টের ভেতর ছয় দফার পক্ষে বক্তব্য-বিবৃতি দিতেন। বঙ্গবন্ধু সে বিষয়েও ভুক্তি লিখেছেন, 'দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্তকরণের উপর স্বতন্ত্র দলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামানের ও গণপরিষদ সদস্যের অধিকার সংক্রান্ত মুলতবি প্রস্তাব এবং বিরোধীদের নেতা আবদুল মালেক উকিলের আনীত মুলতবি প্রস্তাব স্পিকার সাহেব কর্তৃক অগ্রাহ্য করার প্রতিবাদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র দলীয় সদস্যরা পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন। বিরোধী দলের ও স্বতন্ত্র দলের সদস্যরা কালো ব্যাজ পরিধান করেন... (১৯শে জুন ১৯৬৬)।

৭ই জুন (১৯৬৬) উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিক্রিয়া

শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ই জুন ১৯৬৬ তারিখে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। দেশের শ্রমিক শ্রেণি প্রথমবারের মতো একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। ৭ই জুনের কর্মসূচির সফলতা নিয়ে বঙ্গবন্ধু বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। আশাবাদও ছিলেন ধর্মঘট সফল হবে। ৬ই জুন (১৯৬৬) তিনি ডায়েরির পাতায় লেখেন: 'আগামীকাল ধর্মঘট। পূর্ব বাংলার জনগণকে আমি জানি, হরতাল তারা করবে। রাজবন্দিদের মুক্তি তারা চাইবে। ছয় দফা সমর্থন করবে।... ঘরে এসে বই পড়তে শুরু করে আবার মনটা চঞ্চল হয়ে যায়, আবার বাইরে যাই– কেবল একই চিন্তা। এইভাবে সারা সকালটা কেটে গেল। খাওয়া-দাওয়া কোনো দিকেই আমার নজর নাই। ভালও লাগছে না কিছুই। যাহোক দুপুর বেলা খাওয়ার পূর্বেই কাগজগুলি এল। ধরপাকড় চলছে সমানে। কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে। যশোর আওয়ামী লীগ অফিস তল্লাশি করেছে। ভূতপূর্ব মন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মশিয়ুর রহমান প্রতিবাদ করেছেন। ... ঢাকার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্যরা এক যুক্ত বিবৃতিতে আমাকেসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি দাবি করিয়াছে, আর ৬ দফার দাবিকে সমর্থন করিয়াছে এবং জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছে।

৯ জন আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি ও ধরপাকড়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তাদের মুক্তির দাবি করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ,

শ্রমিক, ছাত্র ও যুব কর্মীরা হরতালকে সমর্থন করে পথ সভা করে চলেছে। মশাল শোভাযাত্রাও একটি বের করেছে। শত অত্যাচার ও নির্যাতনেও কর্মীরা ভেঙে পড়ে নাই। আন্দোলন চালাইয়া চলেছে। নিশ্চয়ই আদায় হবে জনগণের দাবি' (৬ই জুন, ১৯৬৬)।

কারাগারের রোজনামচার ৭ই জুনের (১৯৬৬) ভুক্তিটি ঐ দিনের ঘটনাবলি নিয়ে। জেলে বন্দি থেকেও বঙ্গবন্ধু এক নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন[১] :

> সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। কি হয় আজ? আবদুল মোনায়েম খান যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় কিছু একটা ঘটবে আজ। কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে খবর আসলো দোকান-পাট, গাড়ি, বাস, রিকশা সব বন্ধ। শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল চলেছে। এই সংগ্রাম একলা আওয়ামী লীগই চালাইতেছে। আবার সংবাদ পাইলাম পুলিশ আনছার দিয়ে ঢাকা শহর ভরে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই জনগণ বে-আইনী কিছুই করবে না। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের রয়েছে। কিন্তু এরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে দিবে না।
>
> আবার খবর এল টিয়ার গ্যাস ছেড়েছে। লাঠি চার্জ হতেছে সমস্ত ঢাকায়। আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। কয়েদিরা কয়েদিদের বলে। সিপাইরা সিপাইদের বলে। এই বলাবলির ভিতর থেকে কিছু খবর বের করে নিতে কষ্ট হয় না। তবে জেলের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রবল গুজবও রটে।
>
> অনেক সময় এসব গুজব সত্যই হয়, আবার অনেক সময় দেখা যায় একদম মিথ্যা গুজব। কিছু লোক গ্রেপ্তার হয়ে জেল অফিসে এসেছে। তার মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চাই বেশি। রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। ১২টার পরে খবর পাকাপাকি পাওয়া গেল যে হরতাল হয়েছে, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, কৃষকের বাঁচবার দাবি তারা চায়-এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যে হয়েই গেল।
>
> এ খবর শুনলেও আমার মনকে বুঝাতে পারছি না। একবার বাইরে একবার ভিতরে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। বন্দি আমি, জনগণের মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কি করতে পারি! বিকালে আবার গুজব শুনলাম গুলি হয়েছে, কিছু লোক মারা গেছে। অনেক লোক জখম হয়েছে। মেডিকেল হাসপাতালেও একজন মারা গেছে। একবার আমার মন বলে, হতেও পারে, আবার ভাবি সরকার কি এতো বোকামি করবে? ১৪৪ ধারা দেওয়া হয় নাই। গুলি চলবে কেন? একটু পরেই খবর এল ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। মিটিং হতে পারবে না। কিছু জায়গায় টিয়ার গ্যাস মারছে সে খবর পাওয়া গেল।
>
> বিকালে আরও বহুলোক গ্রেপ্তার হয়ে এল। প্রত্যেককে সামারী কোর্ট করে সাজা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাহাকেও একমাস, কাহাকে দুই মাস। বেশির ভাগ লোকই রাস্তা থেকে ধরে এনেছে শুনলাম। অনেকে নাকি বলে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম ধরে নিয়ে এল। আবার জেলও দিয়ে দিল। সমস্ত দিনটা পাগলের মতোই কাটলো আমার। তালাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে খবর পেলাম নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁ, কার্জন হল ও পুরানা ঢাকার কোথাও কোথাও গুলি হয়েছে, তাতে অনেক লোক মারা গেছে। বুঝতে পারি না সত্য কি মিথ্যা! কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না। সেপাইরা আলোচনা করে, তার থেকে কয়েদিরা শুনে আমাকে কিছু কিছু বলে।
>
> তবে হরতাল যে সাফল্যজনকভাবে পালন করা হয়েছে সে কথা সকলেই বলছে। এমন হরতাল নাকি কোনোদিন হয় নাই, এমনকি ২৯শে সেপ্টেম্বরও না। তবে আমার মনে হয় ২৯শে সেপ্টেম্বরের মতোই হয়েছে হরতাল।
>
> গুলি ও মৃত্যুর খবর পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। শুধু পাইপই টানছি– যে এক টিন তামাক বাইরে আমি ছয়দিনে খাইতাম, সেই টিন এখন চারদিনে খেয়ে ফেলি। কি হবে? কি হইতেছে? দেশকে এরা কোথায় নিয়ে যাবে, নানা ভাবনায় মনটা আমার অস্থির হয়ে রয়েছে। এমনিভাবে দিন শেষ হয়ে এল। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা জেলে আছি। তবুও কর্মীরা, ছাত্ররা ও শ্রমিকরা যে আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে, তাদের জন্য ভালবাসা দেওয়া ছাড়া আমার দেবার কিছুই নাই।
>
> মনে শক্তি ফিরে এল এবং আমি দিব্যচোখে দেখতে পেলাম 'জয় আমাদের অবধারিত'। কোনো শক্তি আর দমাতে পারবে না।
>
> অনেক রাত হয়ে গেল, ঘুম তো আসে না। নানা চিন্তা এসে পড়ে। এ এক মহাবিপদ। বই পড়ি, কাগজ উলটাই– কিন্তু তাতে মন বসে না।

৮ই জুনেও বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ ভুক্তি লিখেছেন। পুরোটাই ছয় দফা আন্দোলনের ইতিহাস। লিখেছেন তিনি[২]:

> ভোরে উঠে শুনলাম সমস্ত রাত ভর গ্রেপ্তার করে জেল ভরে দিয়েছে পুলিশ বাহিনী। সকালেও জেল অফিসে বহু লোক পড়ে রয়েছে। প্রায় তিনশত লোককে সকাল ৮টা পর্যন্ত জেলে আনা হয়েছে। এর মধ্যে ৬ বৎসর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়সের লোকও আছে। কিছু কিছু ছেলে মা মা করে কাঁদছে। এরা দুধের বাচ্চা, খেতেও পারে না নিজে। কেস টেবিলের সামনে এনে রাখা হয়েছে। সমস্ত দিন এদের কিছুই খাবার দেয় নাই। অনেকগুলি যুবক আহত অবস্থায় এসেছে। কারও পায়ে জখম, কারও কপাল কেটে গিয়াছে, কারও হাত ভাঙ্গা এদের চিকিৎসা করা বা ঔষধ দেওয়ার কোনো দরকার মনে করে নাই কর্তৃপক্ষ। গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছিল অন্য জায়গায়, সেখান থেকে সন্ধ্যার পর জেলে এনে জমা দেওয়া শুরু করে। দিনভরই লোক আনছিল, অনেক। কিছু সংখ্যক স্কুলের ছাত্রও আছে। জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেহ কেহ খুবই ভাল ব্যবহার করেছে। আবার কেহ কেহ খুবই খারাপ ব্যবহারও করেছে। বাধ্য হয়ে জেল কর্তৃপক্ষকে জানালাম, অত্যাচার বন্ধ করুন। তা না হলে ভীষণ গোলমাল হতে পারে। মোবাইল কোর্ট করে সরকার গ্রেপ্তারের পরে এদের সাজা দিয়ে দিয়েছে। কাহাকেও তিন মাস, আর কাহাকেও দুই মাস, এক মাসও কিছুসংখ্যক ছেলেদের দিয়েছে। সাধারণ কয়েদি, যাদের মধ্যে অনেকেই মানুষ খুন করে অথবা ডাকাতি করে জেলে এসেছে তারাও দুঃখ করে বলে, এই দুধের বাচ্চাদের গ্রেপ্তার করে এনেছে! এরা রাত ভর কেঁদেছে। ভাল করে খেতেও পারে নাই।

এই সরকারে কাছ থেকে মানুষ কেমন করে বিচার আশা করে?... মেটের পীড়াপীড়িতে নাস্তা খেতে বসেছিলাম। খেতে পারি নাই। দুপুরে ভাত খেতে বসেছি একই অবস্থা। সঠিক খবর না পাওয়ার জন্যই মন আরও খারাপ। খবরের কাগজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কাগজ আসতে খুব দেরি হতেছে, ২টার সময় কাগজ

এল। আমি পূর্বে যা অনুমান করেছি তাই হলো। কোনো খবরই সরকার সংবাদপত্রে ছাপতে দেয় নাই। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন :

> ধর্মঘটের কোনো সংবাদই নাই। শুধু প্রেস নোট। *ইত্তেফাক*, *আজাদ*, *অবজারভার* সকলেরই একই অবস্থা। একেই বলে 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'। *ইত্তেফাক* মাত্র চার পৃষ্ঠা। কোন জেলার কোন সংবাদ নাই। প্রতিবাদ দিবস ও হরতাল যে পুরোপুরি পালিত হয়েছে বিভিন্ন জেলায় সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ রইল না। খবরের কাগজগুলি দেখে আমি শিহরিয়া উঠলাম। পত্রিকার নিজস্ব খবর ছাপতে দেয় নাই। তবে সরকারি প্রেসনোটেই স্বীকার করেছে পুলিশের গুলিতে দশজন মারা গেছে, তখন কতগুণ বেশি হতে পারে ভাবতেও আমার ভয় হলো। কতজন জখম হয়েছে সরকারি প্রেসনোটে তাহা নেই। সমস্ত দোষই যেন জনগণের। যেখানে উসকানি দিতেছে সরকারের প্রতিনিধিরা, আওয়ামী লীগ সেখানে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে, 'শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ দিবস পালন করতে চাই'। এবং সে অনুযায়ী তারা কর্মীদের নির্দেশও দিয়েছে। এখন জনগণের দোষ দিয়ে লাভ নাই। যেখানে পুলিশ ছিল না সেখানে কোনো গণ্ডগোল হয় নাই। চকবাজার ও অন্যান্য জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট হয়েছে। সে খবর পেয়েছি (৮ই জুন ১৯৬৬)।

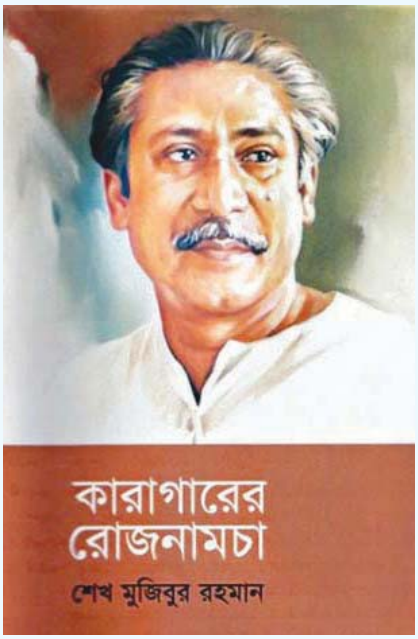

পরবর্তী দিনগুলোও বঙ্গবন্ধু ৭ই জুনের ও তার পরের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। ছয় দফা আন্দোলন নিয়ে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা, পত্রপত্রিকার ভূমিকা, অন্যান্য রাজনীতিবিদদের মন্তব্য ইত্যাদিও বঙ্গবন্ধু ডায়েরির পাতায় লিখেছেন।

প্রবাসী বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া

৭ই জুন (১৯৬৬) ছয় দফার পক্ষে হরতাল পালনের সময় পুলিশের গুলিবর্ষণে ১১ জন নিহত হলে তার প্রতিক্রিয়ায় কেবল সমগ্র বাংলাদেশই নয়, সুদূর ইংল্যান্ডে বসবাসরত বাঙালিরাও ক্ষুব্ধ হন।

ইংল্যান্ড থেকে আমাকে এক তারবার্তা পাঠাইয়াছে 'প্রবাসী বাঙালীরা সমগ্র বৃটেনে শহীদ দিবস পালন করবে ১৭ ও ১৮ জুন।' ব্রিটেনস্থ পাকিস্তানিদের প্রতিষ্ঠান প্রগতি ফ্রন্টের জেনারেল সেক্রেটারি এস এম হোসেন বৃটেনের সকল পাকিস্তানি নাগরিক ও পাকিস্তানি সংস্থাসমূহের প্রতি সাফল্যজনকভাবে শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের দ্বারা অত্যাচারী জালেমশাহীর পাশবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণ, দুর্নীতি, অবিচার ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের অবসানের জন্য আমাদের সংঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তুলিতে হইবে।'

এই সংবাদ *দৈনিক আজাদ* কাগজে ৭ই জুন ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাহির হয়েছে।

'বৃটেনস্থ পাকিস্তানিদের পক্ষ হইতে জনাব হোসেন ও 'পাকিস্তান সমিতি'র প্রেসিডেন্ট জনাব আফরোজ বখত দেশ ও জনগণের জন্য সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রাম পরিচালনা ও দুঃখ ভোগের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া এক তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

তারবার্তায় তাহারা বলেন, 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপনি যে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন তাহাতে আমাদের সমর্থন রহিয়াছে। এই আন্দোলনকে নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাহায্য দানের জন্য আমরা প্রস্তুত রহিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আমাদের প্রাণদানকারী ভ্রাতাদের রক্তপাত ব্যর্থ যাইবে না। আমরা তাহাদের জন্য ও একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছি– জনসাধারণের প্রতি ইহাই আমাদের বাণী।'

'জাতীয় পরিষদের ভিতর ও বাহিরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে তারবার্তায় জনাব নূরুল আমীনের প্রতিও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

তারবার্তায় পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক রক্তপাতের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে ইহার ফলে পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বাধিক কলঙ্কময় অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল' (১৫ই জুন, ১৯৬৬)।[৩]

তারবার্তায় জাতীয় সংহতির স্বার্থে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিদান ও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। বঙ্গবন্ধু মন্তব্য লেখেন, 'যখন প্রবাসী পাকিস্তানিরাও অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে এবং ন্যায্য দাবি সমর্থন করিতে শুরু করিয়াছে তখন সাফল্যের আর বেশি দিন নাই' (১৫ই জুন, ১৯৬৬)।

করাচি আওয়ামী লীগের বিবৃতি

২৪শে জুন (১৯৬৬) বঙ্গবন্ধু লিখেছেন :

> দুপুরে কাগজ এলে *মর্নিং নিউজে* দেখলাম করাচী আওয়ামী লীগ সভাপতি বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে লিখেছেন, জেল থেকে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, মালিক গোলাম জিলানী, খাজা মহম্মদ রফিক, জনাব সিদ্দিকুল হাসান তাকে জানাইয়াছে যে, 'তারা শেখ মজিবুরের ৬ দফা প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।' এই বিবৃতির প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমি জানি সত্যের জয় একদিন হবেই'। (২৪শে জুন, ১৯৬৬)

ছয় দফা আন্দোলনের ভীতু পক্ষ

কিছু দল ও ব্যক্তি প্রকাশ্যে ছয় দফা ঘোষণা না করলেও গোপনে গোপনে সমর্থন করেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'ন্যাপের কোনো কোনো নেতা ৬ দফা গোপনে গোপনে সমর্থন করলেও লজ্জায় বলেন না, আর কেউ কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করেন'। বঙ্গবন্ধু তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'দিন আসছে ৬ দফা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মেনে এদেশে রাজনীতি করতে হবে না।' (২৫শে জুন, ১৯৬৬)

ছয় দফার বিরোধ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও ন্যাপ প্রসঙ্গে

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'মওলানা ভাসানী সাহেবও ছয় দফার বিরুদ্ধে বলেছেন, কারণ দুই পাকিস্তান নাকি আলাদা হয়ে যাবে'।... 'মওলানা সাহেব পশ্চিম পাকিস্তানে যেয়ে একথা বলেন, আর পূর্ব বাংলায় এসে অন্য কথা বলেন। যে লোকের যে মতবাদ সেই লোকের কাছে সেই ভাবেই কথা বলেন। আমার চেয়ে কেউ তাঁকে বেশি জানে না' (২রা জুন, ১৯৬৬)। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আরও ভুক্তি আছে। যেমন: 'খবরের কাগজে এসেছে। ভাসানী সাহেবের রাজনৈতিক অসুখ ভাল হয়ে গেছে। যখন গুলি চলছিল, আন্দোলন চলছিল, গ্রেপ্তার সমানে সমানে চলেছে তখন দেখলাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আবার দেখলাম দুই তিন দিন পরে কোথায় যেতে ছিলেন পড়ে যেয়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছেন। হঠাৎ অসুস্থ মানুষ আবার বাড়ির বাহির হলেন কি করে? যখন আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য কর্মীরা কারাগারে– এক নারায়ণগঞ্জে সাড়ে তিনশত লোকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে তখনও কথা বলেন না। আওয়ামী লীগ যখন জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন করল তখন একদল ভাসানীপন্থী (!) এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে সরকারের সাথে হাত ও গলা মিলিয়েছে...' (২৮শে জুন, ১৯৬৬)।

আইয়ুব খানের বেতার ভাষণের বিষয়েও বঙ্গবন্ধু ডায়েরির পাতায় ভুক্তি লিখেছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁর মাস পহেলা বেতার ভাষণে (১.৭.১৯৬৬) বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত এবং জনগণ ভুল পথে পরিচালিত হওয়া হইতে রক্ষা পাইয়াছে (২রা জুলাই, ১৯৬৬)। বাস্তবে তখনও ছয় দফার আন্দোলন সারাদেশেই চলছিল।

ছয় দফা আন্দোলনে পত্রপত্রিকার ভূমিকা প্রসঙ্গেও বঙ্গবন্ধু ডায়েরিতে লিখেছেন।

৫ই জুন (১৯৬৬) তারিখে লেখেন, '*পাকিস্তান অবজারভারে* [ছয় দফা আন্দোলনের] খবর এরা ছাপে *আজকাল*'। *মর্নিং নিউজ* পশ্চিমা শিল্পপতিদের মুখপত্র। সরকারের অঙ্গ সমর্থন। '*আজাদ* কাগজ সকল সময়ই কিছু কিছু সংবাদ বহন করে'।

৯ই জুলাই (১৯৬৬) তারিখে বঙ্গবন্ধু লেখেন, 'প্রায় সকল কাগজকেই সরকার ছলে বলে কৌশলে নিজের সমর্থন করে নিয়েছে। যে দুচারটা কাগজে এখনও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে জনগণের দাবি দাওয়া তুলে ধরেছে তাদের শেষ করার পন্থা অবলম্বন করেছে সরকার। *ইত্তেফাক* প্রেস তো বাজেয়াপ্ত। ঢাকার কাগজের মধ্যে *মর্নিং নিউজ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *পয়গাম*, *পাসবান* সরকারের সমর্থক কাগজ। প্রথমোক্ত দুটিই প্রেস ট্রাস্টের। *ইত্তেফাক* তালাবদ্ধ। সংবাদের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে শেষ করা অবস্থা। *পাকিস্তান অবজারভার* তো 'যখন যেমন, তখন তেমন...'। হাজারো দমন-পীড়ন সত্ত্বেও কিছু সাংবাদিক ছয় দফা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেন। বঙ্গবন্ধু সে বিষয়েও ভুক্তি লিখেছেন :

> দুপুরে কাগজ এলে দেখলাম সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদ, নিখিল পাক সংবাদপত্র সমিতি ও ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি সমবায়ে গঠিত যুক্ত কমিটি অদ্য *দৈনিক ইত্তেফাকের* বিরুদ্ধে গৃহীত সরকারি ব্যবস্থার প্রতিবাদে আগামী ৫ই জুলাই একদিন প্রতীকী ধর্মঘট পালনের জন্য সংবাদপত্র শিল্প ও সংবাদ সরবরাহ সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। ৫ই জুলাই সান্ধ্য পত্রিকা ও ৬ই জুলাই কোনো প্রভাতি পত্রিকা যাহাতে প্রকাশিত হতে না পারে সেই জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেনের গ্রেপ্তার ও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেন। (৩০শে জুন, ১৯৬৬)

প্রভাবে আমরা দেখি, বঙ্গবন্ধুর লেখা *কারাগারের রোজনামচা* বইটিতে ছয় দফা আন্দোলনের বহুমাত্রিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

প্রবন্ধটির কলেবর বৃদ্ধি না করে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি ভুক্তি উপস্থাপন করে এটি এখানেই শেষ করছি। ছয় দফা আন্দোলন সফল হবেই এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধু ৮ই জুন ১৯৬৬ তারিখে লিখেছেন:

> ...এদের ত্যাগ বৃথা যাবে না। এই দেশের মানুষ তার ন্যায্য অধিকার আদায় করবার জন্য যখন জীবন দিতে শিখেছে তখন জয় হবেই, কেবলমাত্র সময় সাপেক্ষ। শ্রমিকরা কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কৃষকরা কাজ বন্ধ করেছে। ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছে। ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছেড়েছে। এতবড় প্রতিবাদ আর কোনোদিন কি পাকিস্তানে হয়েছে?
>
> ছয় দফা যে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবি– পশ্চিমা উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী যে আর পূর্ব বাংলার নির্যাতিত গরীব জনসাধারণকে শোষণ বেশিদিন করতে পারবে না, সে কথা আমি এবার জেলে এসেই বুঝতে পেরেছি। বিশেষ করে ৭ই জুনের যে প্রতিবাদে বাংলার গ্রামেগঞ্জে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফেটে পড়েছে, কোনো শাসকের চক্ষু রাঙানি তাদের দমাতে পারবে না। পাকিস্তানের মঙ্গলের জন্য শাসকশ্রেণীর ছয় দফা মেনে নিয়ে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করা উচিত। যে রক্ত আজ আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করল, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যেভাবে এ দেশের ছাত্র-জনসাধারণ জীবন দিয়েছিল তারই বিনিময়ে বাংলা আজ পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। রক্ত বৃথা যায় না। যারা হাসতে হাসতে জীবন দিলো, আহত হলো, গ্রেপ্তার হলো, নির্যাতন সহ্য করল তাদের প্রতি এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের নীরব প্রাণের সহানুভূতি ছাড়া জেলবন্দি আমি আর কি দিতে পারি। আল্লাহর কাছে এই কারাগারে বসে তাদের আত্মার শান্তির জন্য হাত তুলে মোনাজাত করলাম। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এদের মৃত্যু বৃথা যেতে দেব না, সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। (৮ই জুন, ১৯৬৬, বুধবার)

তথ্যসূত্র

১. শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৭, পৃ. ৬৯-৭০।

২. ঐ, পৃ. ৭১।

৩. ঐ, পৃ. ৯২।

ড. মো. মাহবুবর রহমান: প্রফেসর (অব.), ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিস্টিংগুইসড প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, mahabub52_heritage@yahoo.com

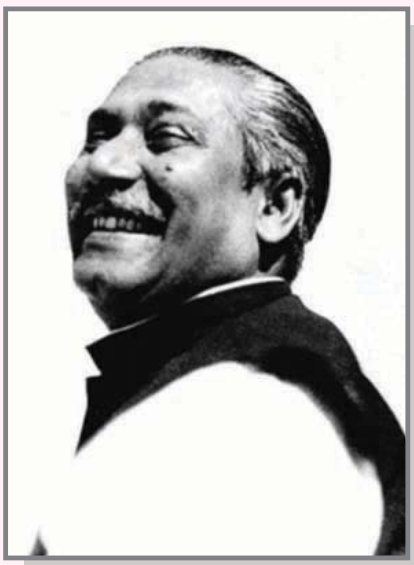

ছয় দফা আন্দোলনের পথপরিক্রমায় আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা

মুহম্মদ মোহসিন রেজা

বাঙালির প্রাণের দাবি ছয় দফা

ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ছয় দফা দাবি থেকেই বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনা। তাই ছয় দফাকে বাঙালির 'মুক্তির সনদ' বলা হয়ে থাকে। পরাধীনতা থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার জন্য বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে এই ন্যায়সংগত আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন। তিনি ৫ই ফেব্রুয়ারি তাসখন্দ চুক্তিকে কেন্দ্র করে লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটিতে এই দাবিনামা উত্থাপন করেন এবং পরের দিন সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে ছয় দফাকে স্থান দিতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও অনুরোধ জানান। কিন্তু সম্মেলনের আয়োজকেরা বঙ্গবন্ধুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ওই সম্মেলনে আর যোগ দেননি। তখন পাকিস্তানের খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা আখ্যা দিয়ে সংবাদ ছাপানো হয়। তবে লাহোরে অবস্থানকালেই বঙ্গবন্ধু ছয় দফার বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানিয়ে দেন। এরপর ঢাকায় ফিরে বিমানবন্দরেই সাংবাদিকদের সামনে ছয় দফা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরেন। ১৩ই মার্চ ছয় দফা এবং দলের অন্যান্য বিস্তারিত কর্মসূচি দলের কার্যনির্বাহী সংসদে পাস করিয়ে নেন। এরপর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শুরু হয় গণ-আন্দোলন।

জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের বেশিরভাগই পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরবরাহ করা হলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই অঞ্চলের জনগণের প্রতি সব ক্ষেত্রে বৈষম্য করত। পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুবিধা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানে কুক্ষিগত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সুবিধা আনুপাতিক হারে ছিল না। বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমাগত বৈষম্যের ফলে বাংলার জনগণ নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তাই এসব বৈষম্য নিরসনের জন্য, বাংলার জনগণের মুক্তির নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবি উত্থাপন অবশ্যম্ভাবী ছিল। বাঙালির স্বাধিকারের এই দাবি পরবর্তীকালে বাঙালির 'প্রাণের দাবি' ও 'বাঁচা-মরার দাবি' হিসেবে পরিচিতি পায়। বঙ্গবন্ধু বাংলার জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে অত্যন্ত যৌক্তিক এই দাবিনামা উত্থাপন করলেও বরাবরের মতো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তা উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব বুঝতে পেরে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে সংগঠিত করেন।

ছয় দফা ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা। ছয় দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য ছিল– পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল বা যৌথরাষ্ট্র এবং ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এই ফেডারেশন বা যৌথরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ছয় দফার সমর্থনে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী লালদিঘির পাড়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর তৎকালীন বৃহত্তর চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজের নেতৃত্বে সভা করেন। সেখানে ঘোষণা করা হয়– ছয় দফা না মানলে এক দফার আন্দোলন চলবে, আর সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার আন্দোলন। এ থেকে বুঝা যায়, বঙ্গবন্ধু প্রথমত বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায়সংগত দাবি জানিয়েছিলেন কিন্তু যদি সেটা মানা না হয়, তাহলে বাঙালি জাতিকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার চূড়ান্ত লক্ষ্যে আন্দোলন করা হবে। সেভাবেই ছয় দফা দাবিকে কেন্দ্র করে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার হয়। ছয় দফার দাবিগুলো নিম্নরূপ:

প্রথম দফা: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে;

দ্বিতীয় দফা: ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক এবং অপর সব বিষয় ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

তৃতীয় দফা: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার ব্যবস্থা সংবলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে;

চতুর্থ দফা: দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল

থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে;

পঞ্চম দফা: দুই অংশের মধ্যে দেশীয় পণ্য বিনিময়ে কোনো শুল্ক ধার্য করা হবে না এবং রাজ্যগুলো যাতে যে-কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সংবিধানে তার বিধান রাখতে হবে।

ষষ্ঠ দফা: প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

ছয় দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটা ছিল মূলত স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সোপান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার মাধ্যমে নাগরিক হিসেবে বাঙালিদের সমান অধিকার চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই ন্যায্য দাবিগুলোকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। নিজেদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও গোটা দেশের অর্থনীতিকে কুক্ষিগত রাখার কৌশল হিসেবে তারা ছয় দফাকে পাকিস্তানের দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা বলে আখ্যা দিয়েছে। আসলে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বৈষম্যের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের এই প্রাণের দাবি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রত্যাখ্যান করে, তাই বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য স্বাধীনতার আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। সে কারণে ছয় দফা ও স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাঙালিদের সাথে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ মনোভাব বুঝতে পেরে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মাথায় রেখেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দিয়েছিলেন বলেই পাঁচ বছরের মাথায় ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল।

ছয় দফার পথ পরিক্রমায় এসেছে স্বাধীনতা

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পর থেকে ক্রমেই ছয় দফার প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন তৈরি হয়। বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তায় ও নেতৃত্বে ভীত হয়ে সামরিক জান্তা আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন স্বৈরাচারী সরকার ১৯৬৬ সালের ৮ই মে বঙ্গবন্ধুকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়। তারপর থেকে শুরু হয় তাঁর দুঃসহ জীবনযাপন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা আন্দোলন ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন নতুন মাত্রা পায়। ঐ দিন ছয় দফার পক্ষে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল চলাকালে সরকারের পুলিশবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নারায়ণগঞ্জসহ সারা দেশে শ্রমিকনেতা মনু মিয়াসহ ১১ জন নিহত, বহু লোক আহত এবং গ্রেপ্তার হন।

আইয়ুব-মোনায়েম সরকার পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে নানাধরনের ষড়যন্ত্র করে তাঁর পেছনে লেগেছিল। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকেই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসানো হয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই ষড়যন্ত্রকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' নামে অভিহিত করে। এই অভিযোগে ১৮ই জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সঙ্গে এক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছে। এতে শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করা হয় এবং পাকিস্তান বিভক্তিকরণ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের জনসাধারণ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলনটি এক পর্যায়ে গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। পরবর্তীতে এই গণ-আন্দোলনই 'উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান'-এ রূপ নেয়। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ, পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং বেশ কিছু হতাহতের ঘটনার পর আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করে। অবশেষে ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এই মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পথপরিক্রমায় ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে একচেটিয়া রায় দেন। জনগণ বিজয়ী করলেও স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকরা বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে না দিলে ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এই ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতিকে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশনা দেন। এরপর ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

মুহম্মদ মোহসিন রেজা: উপ-প্রধান তথ্য অফিসার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, pro@mofa.gov.bd

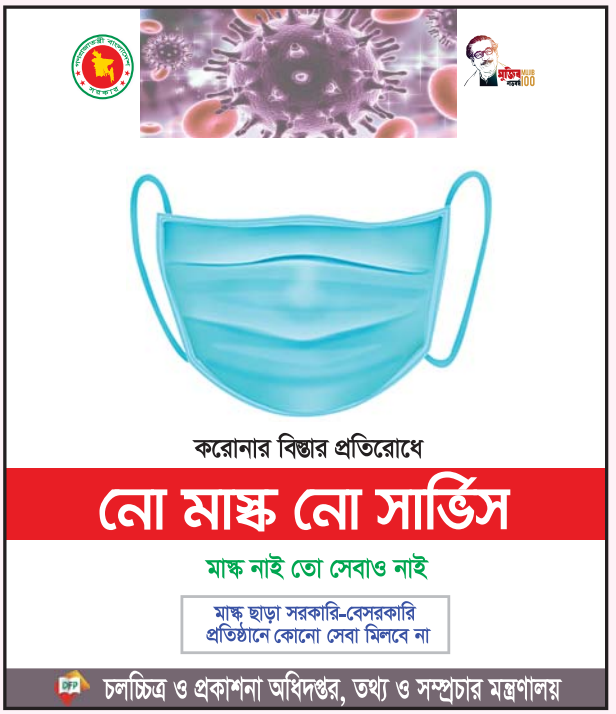

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩

সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ

দীপংকর বর

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়ে আমাদের পরিবেশ। বায়ু, পানি ও মাটিসহ চারপাশের উপাদানগুলো ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকতে পারি। কিন্তু মানুষের বিভিন্ন অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে ক্ষতিকর উপাদানগুলো বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, ফলে মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বায়ু দূষিত হলে মানবদেহে এলার্জি, কাশি, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, উচ্চ রক্তচাপ, মাথাব্যথা ও ফুসফুসে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক রোগ হতে পারে। পানি দূষিত হলে মানুষের কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে, ক্ষেত্রবিশেষে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। শব্দের মাত্রা অসহনীয় হলে মাথা ধরা, শ্রবণশক্তি হ্রাস, মেজাজ খিটখিটে হওয়া ও অনিদ্রাসহ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। শব্দদূষণ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে শিশু, বয়স্ক ও হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নির্দেশনায় বর্তমান সরকার জনগণকে নির্মল বাসযোগ্য পরিবেশ উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের পানিদূষণ, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণসহ সকল প্রকার দূষণ রোধে নিরলসভাবে কাজ করছে। পরিবেশের মান উন্নয়নকে গুরুত্ব প্রদান করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরিবেশ সুরক্ষাকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দানের জন্য বর্তমান সরকার সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তাই সরকার এ বিষয়গুলোতে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরব্যাপী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৭তম অধিবেশনে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনসাধারণকে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবার নির্ধারিত প্রতিপাদ্যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে থাকে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির ঘোষণা মোতাবেক 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে শামিল হই সকলে' প্রতিপাদ্যে এবং 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ' স্লোগানে ২০২৩ সালে বাংলাদেশে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ পালন উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০২২, জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২১ এবং সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের মাঝে লভ্যাংশের চেক বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে শেরেবাংলা নগরে অনুষ্ঠিত পরিবেশ মেলা চলে ৫ই জুন থেকে ১১ই জুন পর্যন্ত এবং বৃক্ষমেলা চলে ৫ই জুন থেকে ২৬শে জুন এবং ১লা জুলাই থেকে ১২ই জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে পরিবেশ দিবসের তাৎপর্যভিত্তিক অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। দিবসের প্রতিপাদ্য ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র এবং পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে স্মরণিকা ও বুকলেট প্রকাশ এবং পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের জন্য সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়। দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। শিশুদের মাঝে পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ বিষয়ক শিশু চিত্রাঙ্কন, বিতর্ক ও স্লোগান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া পরিবেশের মান উন্নয়নের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে জনগণকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এদিন 'গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি' প্রতিপাদ্যে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযানের উদ্বোধন করা হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। জাতীয় বৃক্ষমেলা উপলক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়। মোবাইল ফোন অপারেটরদের মাধ্যমে খুদে বার্তা প্রেরণ করা হয়।

তুলনামূলক স্বল্পমূল্য, সহজলভ্যতা ও ব্যবহারিক উপযোগিতা

থাকায় গত কয়েক দশকে প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্লাস্টিক সামগ্রীর একটি বড়ো ক্ষতিকর দিক হলো এগুলো সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং বছরের পর বছর সমতল ভূমি, পাহাড়, জলাভূমি, সমুদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে বিভিন্নভাবে মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, অনুজীব সর্বোপরি জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণা খাদ্যচক্রে প্রবেশ করায় সরাসরি মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। প্লাস্টিক উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। মূলত তিন পদ্ধতিতে প্লাস্টিক মানবদেহে প্রবেশ করে। সাধারণ পরিবেশ যেমন বাতাস ও পানির মধ্য দিয়ে, খাবার খাওয়ার ফলে এবং প্লাস্টিক পণ্যগুলোর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে। প্রসাধনসামগ্রী রাখার পাত্র, খেলনা, পানির পাইপ, টাইলস, গৃহসজ্জার সামগ্রী, শিশুদের সুইমিং পুল ইত্যাদি পলি ভিনাইল ক্লোরাইড বা পিভিসি প্লাস্টিক পদার্থগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে ক্যান্সার, জন্মগত ত্রুটি, জেনেটিক পরিবর্তন, দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস, আলসার, বধিরতা, চর্মরোগ, লিভার সমস্যা হতে পারে। জুতা, ছাপার কালি, চিকিৎসা ও ল্যাবরেটরির সরঞ্জামাদি ইত্যাদি থ্যালেট বা প্লাস্টিসাইজারজাত প্লাস্টিক ব্যবহার করলে হাঁপানি, ক্যান্সার, জন্মত্রুটি, হরমোন পরিবর্তন, বন্ধ্যাত্ব, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। পানির বোতল তৈরি হয় বিসফেনল নামক প্লাস্টিক থেকে। এটি ব্যবহার করলে ক্যান্সার, প্রতিবন্ধী প্রবণতা, দ্রুত বয়ঃসন্ধি, স্থূলতা, ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগ হতে পারে। পনির ও দই রাখার পাত্র, ফোম ও শক্ত প্লেট, অডিও ক্যাসেট হাউজিং, সিডি কেস, বিল্ডিং ইনসুলেশন, বরফের ছাঁচ, দেয়ালের টাইলস, ট্রে প্রভৃতিতে পলিস্টাইরিন থাকে। এসব তৈরির কারখানার শ্রমিকদের চোখে জ্বালাপোড়া, নাক ও গলায় অস্বস্তি, মাথা ঘোরা, অচেতনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। তাই প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ বিষয়ক এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী।

এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৮ লক্ষ ২১ হাজার ২৫০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদিত হয় এবং শুধু ঢাকা শহরে প্রতিদিন ৬৮১ টনের অধিক প্লাস্টিক বর্জ্য সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র দেশে প্রতিবছর মাথাপিছু প্লাস্টিক ব্যবহারের পরিমাণ ৯ কেজি হলেও শুধু ঢাকায় তা প্রায় ১৮ কেজির মতো। সম্প্রতি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেশে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট প্লাস্টিকের শতকরা ২ ভাগ গিয়ে জমা হচ্ছে মহাসাগরে। ফলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপর এর প্রভাব দিনের পর দিন ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে। ১৯৫০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত অপরিশোধিত তেল দিয়ে তৈরি হয় ৮.৩ বিলিয়ন টন প্লাস্টিক। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ এখনও গৃহস্থালি, গাড়ি বা কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। আরও ১০ শতাংশ প্লাস্টিক পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আর বাকি ৬০ শতাংশ প্লাস্টিকের খোঁজ মেলেনি। এ প্লাস্টিক বর্জ্যগুলো কোথাও না কোথাও পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে যার বেশিরভাগই যাচ্ছে মহাসাগরে। সম্প্রতি জাতিসংঘ প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা যায়, প্রতিবছর প্রায় ৮ শত প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী সমুদ্রযানের নানা বর্জ্য পদার্থ দিয়ে আক্রান্ত হয়। আর এসব বর্জ্যের প্রায় ৮০ শতাংশই প্লাস্টিক। প্লাস্টিক দ্রব্যাদি জলজ জীবকূলের প্রজননে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, সার্কুলার ইকনোমিতে স্থানান্তরের মাধ্যমে সমুদ্রে নিপতিত প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিমাণ ২০৪০ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজন প্লাস্টিক দূষণের ক্ষতিকর দিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশের জনগণকে মুক্ত করতে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক দূষণ দূর করতে সরকার বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যাগ এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ২০২১ সালে উপকূলীয় অঞ্চলের ১২ জেলার ৪০টি উপজেলায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার প্রণীত এ সংক্রান্ত অ্যাকশন প্লান অনুযায়ী ২০২৬ সালের মধ্যে ৯০ শতাংশ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন নিশ্চিত করা, ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বেশ কিছু বিধি, প্রবিধান, নীতি এবং সবুজ বৃদ্ধির কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। সরকার প্লাস্টিকসহ অন্যান্য কঠিন বর্জ্যের টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ জারি করেছে। উক্ত বিধিমালার মূলনীতি হিসেবে বর্জ্য প্রত্যাখ্যান, হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন, পুনরুদ্ধার, পরিশোধন ইত্যাদি ধাপসমূহ অনুসরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সার্কুলার ইকনোমির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিবেশনীতিতে যথাযথভাবে সামুদ্রিক প্লাস্টিক লিটার নিয়ন্ত্রণ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা এবং ইপিআর কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্লাস্টিক দূষণের বিষয়ে টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাসে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন, পরিবহণ, বাজারজাত ও সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৯ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ২,১৯৮টি অভিযান পরিচালনা করে ৩,৬১৭টি মামলা করে ৫ কোটি ৪২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ১৬৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,৭৪৫ মেট্রিক টন পলিথিন, দানা ও কাঁচামাল জব্দ করা হয়েছে। পলিথিনের বিরুদ্ধে সরকারের ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি হিসেবে এ ধারা আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে। পলিথিন ব্যাগের বিকল্প হিসেবে বায়োডিগ্রেডেবল বা বায়োকম্পোস্টেবল ব্যাগ উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পলিব্যাগ উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, ব্যবহার বন্ধে যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফেকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন বাজার সমিতি, পলিথিনের বিকল্প সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবেশবাদী সংগঠনসহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, মেলার আয়োজন করা হয়েছে। সুন্দরবনে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করা হচ্ছে। এ কারণে বনের অভ্যন্তরে পানি ও স্থলভাগে যাতে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, পলিথিন ও অপচনশীল দ্রব্য ফেলতে না পারে সেজন্য

সুন্দরবনে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্লাস্টিক দূষণমুক্ত রাখার স্বার্থে কেউ যদি এসব নির্দেশনা অমান্য করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শুধু সুন্দরবনই নয় দেশের বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বনবনানী যাতে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক দূষণ মুক্ত থাকে সে বিষয়ে সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

প্লাস্টিক দূষণ রোধ কোনো একটি দেশের একার পক্ষে সম্ভব না। তাই বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে এ বিষয়ে কাজ করছে। 'সাউথ এশিয়ান কো অপারেশন অব এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম'-এর 'প্লাস্টিক ফ্রি রিভার্স অ্যান্ড সিজ প্রোগ্রাম' প্রকল্পের আওতায় ট্রান্স বাউন্ডারি প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক 'ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ টুওয়ার্ডস সাসটেইনেবল প্লাস্টিক ইউজ অ্যান্ড মেরিন লিটার প্রিভেনশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্লাস্টিক দূষণ রোধে বাংলাদেশ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথেও কাজ করছে।

প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত সামগ্রীর ব্যবহার থেকে মানুষকে রাতারাতি বিরত রাখা সম্ভব না। তবে এসব সামগ্রীর ব্যবহার সীমিত করা সম্ভব। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সকল ধরনের প্লাস্টিকের পুনঃব্যবহার অথবা পুনঃচক্রায়ন। এ লক্ষ্যে উৎসমূলে এসব বর্জ্যের সংগ্রহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে এবং একইসঙ্গে যত্রতত্র প্লাস্টিক সামগ্রী নিক্ষেপের অভ্যাসও পরিত্যাগ করতে হবে। পলিথিন শপিং ব্যাগের বিকল্প হিসেবে জৈব পচনশীল পলিব্যাগ এবং পাটের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ সুশীল সমাজ এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষে ৫ই জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় প্রদত্ত ভাষণে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষায় বৃক্ষরোপণ করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এদিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বৃক্ষমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, পরিবেশ-প্রকৃতি রক্ষায় ব্যর্থ হলে পরের প্রজন্মের কাছে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতি বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন ক্ষতিকর নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন, পরিবহণ, বাজারজাত ও সংরক্ষণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশে আমাদের দেশের মতো প্লাস্টিক পলিথিন যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায় না, তাই এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতার বিকল্প নেই। এছাড়া পরিবেশমন্ত্রী পরিবেশের মান উন্নয়নে পতিত ও আশপাশের অব্যবহৃত খালি জায়গায় গাছ লাগানোর ও নিয়মিত পরিচর্যা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ী, ভোক্তাসাধারণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকারের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের সকলকে পানিদূষণ, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ সকল প্রকার দূষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত দূষণমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন করতে পারব।

দীপংকর বর: সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, dpnkrbar@gmail.com

নারী শ্রম পরিদর্শকদের নিয়ে সম্মেলন

কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার প্রসার শিরোনামে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে কর্মরত দেশের সকল নারী শ্রম পরিদর্শকের অংশগ্রহণে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে মে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আইএলও'র সহযোগিতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহছানে এলাহী। নারী শ্রম পরিদর্শকদের কর্মক্ষেত্রে পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সম্মেলনে কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সহিংসতা প্রতিরোধ ও এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎ উদ্যোগ গ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার প্রতিজ্ঞা করা হয়।

এ সময় শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব বলেন, বিগত কয়েক বছরে কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যথাযথভাবে আইনের প্রয়োগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা পরিপূর্ণভাবে রোধ করা সম্ভব। তিনি বলেন, সরকার শ্রম আইন প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করার মাধ্যমে নারী শ্রমিকদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো. নাসির উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ মামুন চৌধুরী, আইএলও'র কান্ট্রি ডিরেক্টর তোমো পুটিআইনেন, বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত অ্যান ভ্যান লিউয়েন, বাংলাদেশে কানাডার হাইকমিশনার লিলি নিকোলস বক্তৃতা করেন।

সম্মেলনের সমাপনীতে বক্তারা কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি দূর করা, মাতৃত্ব সুরক্ষা নিশ্চিত করে নারীবান্ধব কাজের পরিবেশ গড়ে তোলা, নেতৃত্বদানকারী পদে আরও বেশি নারী থাকা এবং নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

সম্মেলনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ৮২ জন উপমহাপরিদর্শক, সহকারী মহাপরিদর্শক, শ্রম পরিদর্শকসহ শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তরের মোট ১০০ জন নারী কর্মকর্তা এবং নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে প্লাস্টিক বর্জন: আমাদের ভূমিকা

মেহেদী হাসান শিশির

পরিবেশ দিবস ২০২৩ উপলক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয়েছে– 'প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে শামিল হই সকলে', যা খুবই সময়োপযোগী। অথচ আধুনিকতার নামে সাময়িক সুবিধার জন্য আমাদের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীতে প্লাস্টিকের মতো অপচনশীল ক্ষতিকারক উপাদানের আধিক্যে পৃথিবীকে করে তুলছি বসবাসের অযোগ্য। সামান্য বাজার সদাই করলেও একটা পলিথিনের লোভ আমরা ছাড়তে পারি না। ওয়ান-টাইম কাপে চা খাওয়ার মতো প্লাস্টিকের মোড়কে সহজলভ্য পণ্যে সয়লাব গোটা দেশ। আমাদের সুবিধার জন্য পাট, বেত ও বাঁশের তৈরি পণ্যের ব্যবহার কমছে দিনকে দিন। শহরের পাশাপাশি গ্রামেও এখন প্লাস্টিকের তৈরি পণ্যের ছড়াছড়ি। বাঁশ-বেতের তৈরি কুলা, ডুলা, ঝুড়ি, চেয়ার, মোড়া কিংবা পাটের তৈরি বস্তা, রশি বা মালচার পরিবর্তে প্লাস্টিকের তৈরি পণ্য সর্বত্র। প্লাস্টিকের বোতলে কোমলপানীয় প্রায় প্রতিটি দোকানেই আছে। প্রায় প্রতিটি ঘরেই মাটির কলসি বা কাঁচের জগের পরিবর্তে প্লাস্টিকের জগ, বোতল বা বালতি স্থান করে নিয়েছে। কারণে-অকারণে রাস্তায় রাস্তায় 'সর্বস্তরের জনগণ' এর নামে, এমনকি ছোটো-বড়ো যে-কোনো অনুষ্ঠানে প্যানাফ্লেক্সের ব্যানার টানিয়ে রাখছি অনির্দিষ্টকালের জন্য।

আর প্লাস্টিক সামগ্রীগুলো যত উৎসাহ নিয়ে ব্যবহার শুরু করি ততোধিক অবহেলায় ব্যবহৃত প্লাস্টিকের তৈরি সামগ্রীগুলো ছুঁড়ে ফেলি যেখানে-সেখানে। ফলে পানি নিষ্কাশনের স্থানগুলো সংকুচিত বা বন্ধ হয়ে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা দেখা যায় বেশির ভাগ শহরে। পুকুর-জলাশয়, খালবিল, নদীনালা এমনকি সাগর-মহাসাগরগুলোও প্লাস্টিকের সরব উপস্থিতিতে হুমকির মুখে। প্লাস্টিক দূষণের কবল থেকে রেহাই পায়নি পাহাড়ও।

উইকিপিডিয়ার মতে, 'প্লাস্টিক দূষণ হলো পরিবেশ কর্তৃক প্লাস্টিক পদার্থের আহরণ যা পরবর্তীতে যে বন্যপ্রাণ, বন্যপ্রাণ আবাসস্থল, এমনকি মানবজাতির ওপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে।' আকারের উপর ভিত্তি করে প্লাস্টিক দূষণকে মাইক্রো বা ক্ষুদ্র, মেসো মাঝারি এবং ম্যাক্রো বা বড়ো বর্জ্য এই তিনভাগে শ্রেণীকরণ করা হয়। আর নিয়মিত প্লাস্টিক পদার্থের ব্যবহার প্লাস্টিক দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্ত। পলিথিন ব্যাগ, কসমেটিক প্লাস্টিক, গৃহস্থালির প্লাস্টিক, বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পণ্যের বেশির ভাগই পুনঃচক্রায়ন হয় না বলে এগুলো পরিবেশে থেকে বর্জ্যের আকার নেয়। মূলত মানুষের অসচেতনতাই প্লাস্টিক দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত। প্লাস্টিক এমন এক রাসায়নিক পদার্থ যা পরিবেশে পচতে অথবা কারখানায় পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করতে প্রচুর সময় লাগে। এজন্য একে 'অপচ্য পদার্থ' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। ফলে প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। সাধারণত উদ্ভিদকূল, জলজ প্রাণী, দ্বীপ অঞ্চলের প্রাণীরা প্লাস্টিক বর্জ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। প্লাস্টিক বর্জ্য সে সকল প্রাণীর বাসস্থান, খাদ্য সংগ্রহের স্থান ও উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করে। শুধু উদ্ভিদ বা জলজ প্রাণীই নয়, মানুষ প্লাস্টিক দূষণের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। থাইরয়েড হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য প্লাস্টিক দূষণ পরোক্ষভাবে দায়ী। শুধু আমেরিকাতে প্রতিবছর ৫ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে মাত্র ২৪ শতাংশ পুনঃচক্রায়ন হয়ে থাকে, বাকি ৩.৮ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য আকারে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও আমাদের বেশির ভাগ জনগণই ক্ষতিকর প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার করতে অনাগ্রহী।

আমাদের উত্তরসূরিদের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে চাইলে পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশবান্ধব নিয়ন্ত্রিত আচরণ জরুরি। আর এর জন্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর কোনো বিকল্প নেই। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর দাম বাড়িয়ে পাট, বাঁশ, বেত জাতীয় বা কাঁসা-পিতলের মতো পণ্য ব্যবহারে প্রণোদনার পাশাপাশি শিল্পকারখানায় উৎপাদন ও ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। একইসঙ্গে আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে চলমান রেখে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তবেই সম্ভব হতে পারে পরিবেশবান্ধব পৃথিবী।

মেহেদী হাসান শিশির: ব্যবস্থাপক, লাইভলিহুড ও ক্যাশ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি), বাংলাদেশ কান্ট্রি ডেলিগেশন

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

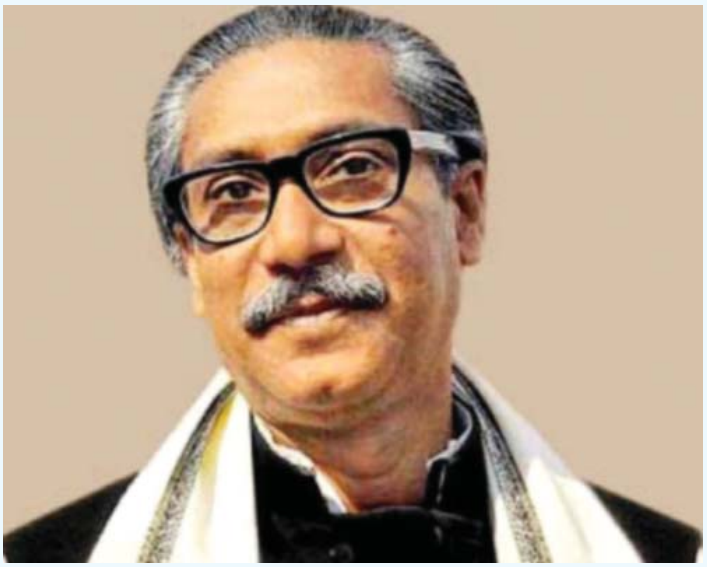

ছয় দফা

বাঙালির মুক্তির সনদ

শামস সাইদ

ছয় দফাকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ। কারণ, স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল ছয় দফায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির এই সনদ যখন ঘোষণা করেন, তখন আওয়ামী লীগের অনেক সিনিয়র নেতাও বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মতো অভিযোগ তুলেছিলেন। তাদের ধারণা ছিল, ছয় দফা ঘোষণার পর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সামনে বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবেন না। ধ্বংস হয়ে যাবে আওয়ামী লীগ। তাদের ধারণা একেবারে অমূলক ছিল না। ছয় দফার কারণে বঙ্গবন্ধুর নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজায় শাসকগোষ্ঠী। চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ। তাদের সে চেষ্টা সফল তো হয়নি হয়েছে উলটো। বাস্তবে ছয় দফা শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সেই সঙ্গে জন্ম হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গৌরবময় অধ্যায় ছয় দফার মূল বক্তব্য ছিল প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রনীতি ছাড়া সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি পৃথক ও সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। সরকারের কর, শুল্ক ধার্য ও আদায় করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকাসহ দুই অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা হিসাব থাকবে এবং পূর্ব বাংলার প্রতিরক্ষা ঝুঁকি কমানোর জন্য এখানে আধাসামরিক বাহিনী গঠন ও নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক এই ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা বলে চিহ্নিত করে। পরে ঢাকায় ফিরে বঙ্গবন্ধু ১৩ই মার্চ ছয় দফা এবং এ ব্যাপারে দলের অন্যান্য বিস্তারিত কর্মসূচি আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদে পাস করিয়ে নেন। তখনই ছয় দফা বঙ্গবন্ধুর একক চিন্তা থেকে দলীয় চিন্তায় রূপান্তরিত হয়।

ছয় দফার আগে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাঙালির ভাষার দাবি জাতীয়তাবাদে রূপ নিলেও ছয় দফা ঘোষণার পর 'জাতীয়তাবাদে'র বিষয়টি একমাত্র স্বাধীনতার এজেন্ডায় পরিণত হয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বুঝে গিয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের যে জনসমর্থন তা আর থামানো সম্ভব নয়। তাই তাঁকে জেলে রাখার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। মোনায়েম খান প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, যতদিন পূর্ববঙ্গের গভর্নর থাকবেন, ততদিন মুজিবুর রহমানকে জেলে থাকতে হবে।

ছয় দফা পেশ করে বঙ্গবন্ধু ঘরে বসে ছিলেন না। তাঁর এই দাবি সাধারণ মানুষকে বোঝাতে দেশজুড়ে সফরে বের হন তিনি। বঙ্গবন্ধু অসংখ্য সভা-সমাবেশ করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘি ময়দানে সমাবেশের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শুরু করেন ছয় দফার পক্ষে জনমতের সফর। ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে ছয় দফা। সমস্ত বাঙালি জাতির প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়।

শাসনক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন স্বৈরাচার আইয়ুব খান। ছয় দফার বিরুদ্ধে আইয়ুব-মোনায়েমের বিষোদ্‌গার চলতেই থাকে। তবে বঙ্গবন্ধু দেশজুড়ে তাঁর গণতান্ত্রিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া বন্ধ করেননি।

পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ক্রমেই জোরালো হতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের ৮ই মে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় পাটকল শ্রমিকদের এক সমাবেশে ভাষণ দিয়ে ঢাকায় ফেরেন বঙ্গবন্ধু। সে রাতে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে গ্রেপ্তার হন তাজউদ্দীন আহমদসহ আরও কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা। তাঁদের স্থান হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

মুজিবের নামে মামলা আর বার বার তাঁকে গ্রেপ্তার করে এ ধরনের হয়রানিতে জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এর মাঝে দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ছয় দফার বাস্তবায়ন নীতি অব্যাহত থাকবে। ৭ই জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল পালন করা হবে। এ কর্মসূচি ঘোষণার পর শাসকগোষ্ঠী প্রচার কাজে ব্যাপক বাধা সৃষ্টি ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের আটকে রাখার কৌশল নেয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ সব ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। হরতালকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করে।

হরতাল কর্মসূচি চলাকালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১১ জনকে হত্যা করে পুলিশ। তবু আন্দোলন দমাতে পারছে না শাসকগোষ্ঠী। ছয় দফা জনগণের ব্যাপক সমর্থন পায়।

ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে অনন্য এক স্থান দখল করে আছে। *কারাগারের রোজনামচা*-তে বঙ্গবন্ধু সে কথা তুলে ধরেছেন এভাবে– 'সকালে ঘুম থেকে উঠেই শুনলাম রাতে কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়ে এসেছে। বন্দি, সিপাহীরা আলোচনা করছে। ব্যস্ত হয়ে গেলাম; বুঝতে বাকি রইলো না আওয়ামী

লীগের নেতা এবং কর্মীদের নিয়ে আসা হয়েছে, ৭ই জুনের হরতালকে বানচাল করার জন্য।'

বঙ্গবন্ধু এ সময় কিছু রাজনীতিবিদের মুখোশও খুলে দিয়েছিলেন। ছয় দফা নিয়ে এক প্রবন্ধে তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন, 'পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন, এই রাষ্ট্র বাঙালির জন্য তৈরি হয়নি। একদিন বাঙালিকেই বাঙালির ভাগ্যনিয়ন্তা হতে হবে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই তাই এই একজন মানুষ (বঙ্গবন্ধু) তাঁর লক্ষ্যও নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তাঁর সে লক্ষ্য পূরণও হয়। ১৯৬৬ সালে এ ছয় দফা প্রণয়নের পর বঙ্গবন্ধু এটি গ্রহণ করার জন্য আতাউর রহমান খানসহ তৎকালীন পূর্ব ও পাকিস্তানের বিরোধী দলের সব নেতার কাছেই গিয়েছিলেন। কিন্তু ছয় দফা নিয়ে অগ্রসর হলে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে– এমন ভয় থেকে কোনো নেতাই এগিয়ে আসেননি। তখন বঙ্গবন্ধু নিজেই সিদ্ধান্ত নেন ছয় দফা নিয়ে তিনি জনগণের কাছে যাবেন। এর পরই এ নিয়ে জনজাগরণ সৃষ্টি হয়।'

ছয় দফা ঘোষণার পর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ-এর পূর্ব পাকিস্তান প্রধান অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি এই যে ছয় দফা দিলেন তার মূল কথাটি কী?' আঞ্চলিক ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন শেখ মুজিব: 'আরে মিয়া বুঝলা না, দফা তো একটাই। একটু ঘুরাইয়া কইলাম।'

স্বাধীনতা যেমন একদিনে অর্জিত হয়নি, তেমনি স্বাধীনতা সংগ্রামের এ পথ কখনই মসৃণ ছিল না। সময়োপযোগী রাজনৈতিক কৌশল রচনা ও অবলম্বন এবং তার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ধাপে ধাপে বাঙালি জাতিকে পৌঁছে দেন স্বাধীনতার লক্ষ্যে। ঐতিহাসিক ছয় দফা তেমনি এক শক্তিশালী সুদূরপ্রসারী কৌশল।

ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনের মাঝে ধাপে ধাপে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছায়, সেই কর্মসূচি সম্পর্কে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত প্রগতিবাদী কিছু দলের মনোভাব ও রাজনৈতিক অবস্থান আর পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শ্রেণির মনোভাবের মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ ছিল না।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে সতর্ক করে দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন,'ছয় দফা জনগণের দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচা-মরার দাবি। এটাকে জোর করে দাবানো যাবে না। দেশের অমঙ্গল হবে, একে চাপা দেবার চেষ্টা করলে। আমাদের শাসকগোষ্ঠীও ভুল করতে চলেছেন। যখন ভুল বুঝবে তখন আর সময় থাকবে না।' শেখ মুজিবুর রহমান, *কারাগারের রোজনামচা*, ২০১৭, পৃ. ১৪২)। বঙ্গবন্ধুর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপ নিতে লাগে মাত্র পাঁচ বছর।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফা কর্মসূচি প্রস্তাব করেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এই কর্মসূচিকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী নকশা' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার সমালোচনা ও বিরোধিতা করে। অথচ ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক দেশ, এক অর্থনীতিভিত্তিক কাঠামোতে রূপান্তরিত করা; এবং দ্বিতীয়ত, বাঙালির জন্য চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করাই ছিল ছয় দফার মূল উদ্দেশ্য। মানে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করা। তাই বলা যায়, ছয় দফা বাঙালির মুক্তির সনদ। যা সত্যিকারেই বাঙালিকে মুক্তি দিয়েছে। শুধু অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়নি, দিয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্রও।

শামস সাইদ: কথাসাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি পদক' প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'জুলিও কুরি পদক' প্রাপ্তির ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে ২৮শে মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন এবং একটি স্যুভেনির প্রকাশনার প্রচ্ছদ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর জুলিও কুরি পদক প্রাপ্তির ওপর একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন, শান্তির বাণী শুনিয়েছেন, কিন্তু নিজেকে জীবন দিতে হয়েছে। আমরা আর চাই না অশান্তি, সংঘাত। আমরা চাই মানুষের জীবনের উন্নতি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ৪১ শতাংশ ছিল, আজকে আমরা তা ১৮ দশমিক ৭ ভাগে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। যেখানে আমাদের হতদরিদ্র ছিল ২৫ দশমিক ৯ ভাগ, সেটা এখন আমরা ৫ দশমিক ৬ -এ নামিয়ে এনেছি। ইনশাল্লাহ এ দেশে কোনো মানুষ হতদরিদ্র থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না, ভূমিহীন থাকবে না।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আজকে সারা বিশ্বের শান্তিরক্ষায় অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমরা এক নম্বর দেশ হিসেবে সারা বিশ্বের শান্তিরক্ষা করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, জনগণই শক্তি, জনগণই ক্ষমতার উৎস। আমি সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। সেই বিশ্বাস নিয়েই আমার পথ চলা। জাতির পিতা শান্তিতে বিশ্বাস করতেন। তৎকালীন শান্তি পরিষদের মহাসচিব বলেছিলেন, শেখ মুজিব কেবল বঙ্গবন্ধু নন, তিনি বিশ্ববন্ধু। মাত্র ৯ মাসে তিনি সংবিধান উপহার দেন, যাতে শান্তির কথা ও দেশের মানুষের মৌলিক অধিকারের কথা ছিল। তিনি পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। জাতির পিতার পররাষ্ট্রনীতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার পররাষ্ট্রনীতি আমরা আজও মেনে চলি। জাতির পিতা সবসময় মানুষের কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। বঙ্গবন্ধু শান্তিতে বিশ্বাস করতেন। জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার সময়ও তিনি শান্তির কথা বলেছিলেন। যিনি সর্বদা শান্তির কথা বলে গেছেন, তাঁকেই জীবন দিতে হলো।

আগামীতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শান্তি পুরস্কার' দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, এটা আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা নেব। এইটুকু আমরা বলতে চাই, আমরা শান্তি চাই। শান্তির পথেই আমরা এগিয়ে যাব। বঙ্গবন্ধু আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, তবে আমরা চাই যে তাঁর দেশ উন্নত এবং সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ে উঠুক।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। বিশ্বশান্তি পরিষদের শান্তি পুরস্কারটি ছিল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার ছিল বাংলাদেশের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার। এই মহান অর্জনের ফলে জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু' থেকে 'বিশ্ববন্ধুতে' পরিণত হন।

প্রতিবেদন: সাইমন ইসলাম

কোরবানির ঈদ

মুহাম্মদ ইসমাঈল

কোরবানির ঈদ আরবি ভাষায় ঈদুল আজহা নামে পরিচিত। বিশ্বের মুসলমানগণ পরম ত্যাগের নমুনা স্বরূপ জিলহজ মাসের দশ তারিখে মহাসমারোহে পশু জবেহের মাধ্যমে যে আনন্দ উৎসব পালন করে তাই ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ। হজরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে প্রাণ প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাঈল (আ.) কে কোরবানি করার যে ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করে গেছেন সে সুন্নতকে জারি রাখার জন্যই মুসলিম জাতি প্রতিবছর পশু কোরবানির মাধ্যমে ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ পালন করে থাকে। মুসলমানগণ জিলহজ মাসের দশ তারিখে উন্মুক্ত মাঠে, খোলা আকাশের নীচে ঈদগাহে একত্রিত হয়ে কোরবানির তাৎপর্যকে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় করার লক্ষ্যে একত্রে ঈদুল আজহার দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করে। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী পশু কোরবানির মাধ্যমে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে।

কোরবানির ইতিহাস

কোরবানির ইতিহাস এতটা প্রাচীন, যতটা প্রাচীন মানবজাতির ইতিহাস। মানুষ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পন্থায় স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা, জীবনদান, আত্মসমর্পণ, প্রেম-ভালোবাসা, বিনয়-নম্রতা, পূজা-অর্চনা, ত্যাগ ও কোরবানি করেছে। ইসলামি শরিয়তে মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং আবেগ অনুভূতির প্রতি লক্ষ রেখে ঐসব পন্থা-পদ্ধতির সংস্কার ও সংশোধনসহ ঐ ত্যাগ বা কোরবানি কেবল মাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। বিভিন্ন যুগে মানুষ প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুকরণে কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তির উদ্দেশ্যে আপন জীবনও উৎসর্গ করেছে। আর এটাই হচ্ছে কোরবানি বা উৎসর্গের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ। এ জীবনদানকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ ধরনের জীবন উৎসর্গ তিনি ব্যতীত অন্যের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন।

ইতিহাসের প্রথম কোরবানি

মানব ইতিহাসের প্রথম কোরবানি দুনিয়ার প্রথম মানব হজরত আদম (আ.)-এর দুইপুত্র হাবিল ও কাবিলের কোরবানি।

আল কোরানে এর উল্লেখ রয়েছে

‘এবং তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের কাহিনি ঠিকমতো শুনিয়ে দাও। যখন তারা দুজনে কোরবানি করল, একজনের কোরবানি কবুল হলো, অপর জনের কোরবানি কবুল হলো না।’ [সূরা আল মায়েদাহ-২৭]

প্রকৃতপক্ষে আদম পুত্র হাবিল মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য একটি অতি সুন্দর দুম্বা কোরবানি হিসেবে পেশ করল। আকাশ থেকে একখণ্ড আগুন এসে হাবিলের কোরবানি জ্বালিয়ে গেল। তখনকার সময় এই জ্বালানোই ছিল কোরবানি কবুল হওয়ার আলামত।

অপরদিকে আদম পুত্র কাবিল অমনোযোগ সহকারে খাদ্যের অনুপযোগী খানিক পরিমাণ খাদ্যশস্য কোরবানি হিসেবে পেশ করল। কিন্তু আকাশ থেকে আগত আগুন কাবিলের খাদ্যশস্য স্পর্শই করল না। আর তা ছিল আল্লাহর দরবারে কোরবানি কবুল না হওয়ার আলামত।

সকল শরিয়তে কোরবানির নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যত শরিয়ত নাজিল হয়েছে সকল শরিয়তের মধ্যেই কোরবানির নির্দেশ ছিল। প্রত্যেক উম্মতের আর্থিক ইবাদতের এ ছিল একটা অপরিহার্য অংশ।

‘এবং আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানির এক রীতি পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি যেন তারা ঐসব পশুর উপর আল্লাহর নাম নিতে পারে, যেসব পশু আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন।’ [সূরা হজ্জ-৩৪]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক শরিয়তের ইবাদতের মধ্যে কোরবানি বিদ্যমান ছিল। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ ও জাতির নবিদের শরিয়তের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোরবানির নিয়ম-পদ্ধতি ও

খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

কিন্তু মৌলিক দিক দিয়ে সকল আসমানি শরিয়তে এ নির্দেশ একই ধরনের ছিল যে, পশু কোরবানি কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নাম নিয়েই করতে হবে।

'অতএব ঐসব পশুর উপরে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম নাও।'

এই আয়াতে পশুর উপর আল্লাহর নাম নেওয়াকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ পশু জবেহ করতে হলে আল্লাহর নাম নিয়ে কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই জবেহ করতে হবে। কারণ এসব পশু তিনিই মানুষকে দান করেছেন। প্রবল শক্তিশালী পশুও তিনি মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। তিনিই এই পশুর মধ্যে মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকার কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

কোরবানির বিস্ময়কর ঘটনা

সারা দুনিয়ার মুসলমানগণ যে কোরবানি করে এবং তার ফলে বিরাট উৎসর্গের যে দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তা প্রকৃতপক্ষে হজরত ইসমাঈল (আ.)-এর ফিদিয়া। আল কোরানে এ মহান কোরবানির ঘটনা উল্লেখ করে তাকে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কোরবানি প্রকৃতপক্ষে এমন এক সংকল্প, দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ ও জীবন দেওয়ার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ যে, মানুষের কাছে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর মালিকানার এবং তাঁর পথেই তা উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত। এটা এ সত্যেরও নিদর্শন যে, আল্লাহর ইঙ্গিত হলেই বান্দাহ তাঁর রক্ত দিতেও দ্বিধা করবে না। এ ধরনের শপথ, আত্মসমর্পণ ও জীবন বিলিয়ে দেওয়ার নাম ঈমান, ইসলাম ও ইহসান। আল কোরানের ঘোষণা:

'যখন সে [ইসমাঈল] তাঁর সাথে চলাফেরার বয়সে উপনীত হলো তখন একদিন ইব্রাহীম তাকে বলল প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যেন জবেহ করছি। বল দেখি কি করা যায়? পুত্র [বিনা দ্বিধায়] বলল, আব্বা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা শীঘ্রই পালন করে ফেলুন। ইনশাল্লাহ আপনি আমাকে অবিচল দেখতে পাবেন।

অবশেষে যখন পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সোপর্দ করল এবং ইব্রাহীম পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিলো [জবেহ করার জন্য], তখন আমরা তাকে সম্বোধন করে বললাম, ইব্রাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমরা সৎ কর্মশীলদের এরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। বস্তুত এ এক সুস্পষ্ট অগ্নি পরীক্ষা। আর আমরা বিরাট কোরবানি ফিদিয়া স্বরূপ দিয়ে তাকে (ইসমাঈলকে) উদ্ধার করেছি। আর আমরা ভবিষ্যতের উম্মতের মধ্যে (ইব্রাহীমের) এ সুন্নাতকে স্মরণীয় করে রাখলাম। শান্তি ইব্রাহীমের উপর, এভাবে জীবনদানকারীদেরকে আমরা এ ধরনের [মর্যদাসম্পন্ন] প্রতিদানই দিয়ে থাকি। নিশ্চিতরূপে সে আমাদের মুমিন বান্দাদের মধ্যে শামিল। [সূরা আসসাফ্ফাত: ১০২-১১১]

যতদিন দুনিয়া টিকে থাকবে, ততদিন মুসলমানদের মধ্যে কোরবানির এ বিরাট স্মৃতি হজরত ইসমাঈল (আ.)-এর ফিদিয়া রূপে অক্ষুণ্ন থাকবে। আল্লাহ এ ফিদিয়ার বিনিময়ে হজরত ইসমাঈল (আ.)-এর জীবন রক্ষা করেন এ উদ্দেশ্যে যে, কিয়ামত পর্যন্ত যেন বান্দাগণ ঠিক এই দিনে দুনিয়াজুড়ে কোরবানি করতে পারে। এভাবে যেন তারা আনুগত্য ও জীবন দেওয়ার এ মহান ঘটনার স্মৃতি জাগ্রত রাখতে পারে। কোরবানির এ অপরিবর্তনীয় সুন্নতের প্রবর্তক হজরত ইব্রাহীম (আ.) এবং হজরত ইসমাঈল (আ.)। আর এ সুন্নতকে কিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখবে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের জীবনদানকারী মুমিনগণ।

শেষ নবি (সা.)-এর প্রতি নির্দেশ

কোরবানি ও জীবনদানের প্রেরণা ও চেতনা সমগ্র জীবনে জাগ্রত রাখার জন্যে সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বল, (হে মুহাম্মদ!) আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যে। তাঁর কোনো শরিক নেই, আমাকে এভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি সকলের আগে তাঁর অনুগত ও ফরমানদার।

আল্লাহর উপর পাকাপোক্ত ঈমান এবং তাঁর তাওহিদের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থ এই যে, মানুষের সকল চেষ্টা-চরিত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট হবে। আর সে ঐ সব কিছু তাঁরই পথে উৎসর্গ করে তার ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও জীবন দেওয়ার প্রমাণ পেশ করবে।

কোরবানির প্রকৃত স্থান তো সেটা যেখানে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ হাজি তাদের নিজ নিজ কোরবারি পেশ করে। প্রকৃতপক্ষে কোরবানি হচ্ছে হজের অন্যতম একটি আমল।

কিন্তু মেহেরবান আল্লাহ এ বিরাট মর্যাদা থেকে তাদেরকেও বঞ্চিত করেননি যারা মক্কা থেকে দূরে রয়েছে এবং হজে শরিক হয়নি। কোরবানির আদেশ শুধু তাদের জন্য নয় যারা বায়তুল্লাহর হজ করে, বরঞ্চ এ এক সাধারণ নির্দেশ। আর এ কোরবানি প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমানের জন্য অপরিহার্য আমল। হাদিস শরিফ থেকে প্রমাণিত আছে যে, হজরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন, নবি (সা.) ১০ বছর মদিনায় বাস করেন এবং প্রতিবছর কোরবানি করতে থাকেন। [তিরমিযি, মিশকাত]

নবি করিম (সা.) বলেন, যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে। [জামেউল ফাওয়ায়েদ]।

হজরত আনাস (র.) বলেন, নবি করিম (সা.) ঈদুল আজহার দিনে বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে কোরবানি করেছে তাকে পুনরায় কোরবানি করতে হবে। যে নামাজের পরে করেছে তার কোরবানি পূর্ণ হয়েছে এবং সে ঠিক মুসলমানের পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

কোরবানির আধ্যাত্মিক দিক

আল কোরান কোরবানির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। সত্য কথা এই যে, কোরবানি প্রকৃতপক্ষে তাই যা এ সব উদ্দেশ্যের অনুভূতি সহকারে করা হয়।

১. কোরবানির পশু আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন

আর কোরবানির উটগুলোকে আমরা তোমার জন্য আল্লাহর নিদর্শনাবলির একটি বানিয়ে দিয়েছি। [সূরা হজ্জ-৩৬]

যে কোরবানি করে সে আসলে এ আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে যে কোরবানির পশুর রক্ত তার আপন রক্তেরই স্থলাভিষিক্ত। সে এ ধরনের আবেগও প্রকাশ করে যে, তার নিজের জীবনও আল্লাহর পথে ঐ ভাবে কোরবানি করতে দ্বিধা নেই, যেভাবে এ পশু সে কোরবানি করছে।

২. কোরবানি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের বাস্তব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম

এভাবে এসব পশুকে তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছি যাতে

করে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। [সূরা হজ্জ-৩৬]

আল্লাহ তায়ালা পশুকে মানুষের বশীভূত করে দিয়ে তাদের উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ এসব থেকে বহু উপকার লাভ করে। তার দুধ পান করে, গোশত খায়। তার হাড়, চামড়া, পশম প্রভৃতি দিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করে। চাষাবাদে তার সাহায্য নেয়। তাদের পিঠে বোঝা বহন করে, তাদেরকে বাহন হিসেবেও ব্যবহার করে। তাদের দ্বারা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তিও প্রকাশ করে। কোরান এসবের উপকারের দিকে ইঙ্গিত করে ও তাদেরকে মানুষের বশীভূত করার উল্লেখ করে– আল্লাহর ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রেরণা সঞ্চার করতে চায়। সেই সাথে এ চিন্তাধারাও সৃষ্টি করতে চায় সে, মহান আল্লাহ এ বিরাট নিয়ামত দান করেছেন– তাঁর নামেই কোরবানি হওয়া উচিত। ফলে কোরবানি আল্লাহর দেওয়া অগণিত নিয়ামতের বাস্তব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম।

৩. কোরবানি আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বহিঃপ্রকাশ

আল্লাহ এভাবে পশুদেরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যাতে করে তোমরা তাঁর দেওয়া হেদায়াত অনুযায়ী তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর। [সূরা হজ্জ-৩৭]

অর্থাৎ আল্লাহর নামে পশু জবেহ করা প্রকৃতপক্ষে একথারই ঘোষণা দেওয়া যে, যে আল্লাহ এসব নিয়ামত দান করেছেন এবং যিনি এসব আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন– তিনিই এসবের প্রকৃত মালিক। কোরবানি সেই আসল মালিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং এ কথারও বাস্তব বহিঃপ্রকাশ যে, মুমিন অন্তর থেকেই আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে সে উপরোক্ত সত্যের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ও ঘোষণা দেয় এবং মুখে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে এ সত্যের স্বীকৃতি দান করে।

কোরবানি প্রাণশক্তি

প্রাক ইসলামি যুগের লোকেরা কোরবানি করার পর তার গোশত বায়তুল্লাহর সম্মুখে এনে রেখে দিত। তার রক্ত বায়তুল্লাহর দেয়ালে মেখে দিত। আল কোরানে আছে, তোমাদের এ গোশত ও রক্তের কোনোই প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তাঁর কাছে তো কোরবানির সে আবেগ অনুভূতি পৌঁছে যা জবেহ করার সময় তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় অথবা হওয়া উচিত। গোশত ও রক্তের নাম কোরবানি নয়। বরঞ্চ কোরবানি এমন এক তত্ত্বেরই নাম যে, আমাদের সব কিছুই আল্লাহর জন্যে এবং এসব কিছুই তাঁর পথে উৎসর্গ করার জন্যে।

কোরবানিদাতা শুধু পশুর গলায় ছুরি চালায় না। বরঞ্চ তার সকল কুপ্রবৃত্তির উপর ছুরি চালিয়ে তাকে নির্মূল করে। এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কোরবানি করা হয়, তা হজরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নত নয়, বরং একটা জাতীয় রেওয়াজ মাত্র। তাতে রক্ত ও গোশতের ছড়াছড়ি হয় বটে, কিন্তু সেই তাকওয়ার অভাব দেখা যায় যা কোরবানির প্রাণশক্তি। ঐসব পশুর রক্ত ও মাংস আল্লাহর কাছে পৌঁছে না– বরঞ্চ তোমাদের পক্ষ থেকে কেবল তোমাদের তাকওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে।

যে কোরবানির পেছনে তাকওয়ার আবেগ-অনুভূতি নেই আল্লাহর দৃষ্টিতে সে কোরবানির কোনোই মূল্য নেই। আল্লাহর কাছে সে আমলই গৃহীত হয় যার প্রেরণা দান করে তাকওয়া।

আল্লাহ শুধু মুত্তাকিদের আমল কবুল করেন।

কোরবানির পদ্ধতি ও দোয়া

জবেহ করার জন্য পশুকে এমনভাবে শোয়াতে হবে যেন তা কেবলামুখী হয়, ছুরি খুব ধারালো হতে হবে। যথাসম্ভব কোরবানির পশু নিজে হাতে জবেহ করতে হবে। কোনো কারণে নিজে জবেহ করতে না পারলে তার নিকট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

জবেহ করার সময় প্রথম এ দোয়া পড়তে হবে

আমি সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ইব্রাহীমের তরিকার উপর একনিষ্ঠ হয়ে ঐ আল্লাহর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো শিরককারীদের মধ্যে নই। আমার নামাজ, আমার কোরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ রাব্বুল আলামিন আল্লাহরই জন্যে, তাঁর কোনো শরীক নেই, এভাবেই আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি অনুগতদের মধ্যে একজন। হে আল্লাহ! এ কোরবানি তোমারই জন্যে পেশ করা হচ্ছে এবং এ কোরবানির পশু তোমারই দেওয়া- [মিশকাত]।

তারপর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে জবেহ করতে হবে। জবেহ করার পর এ দোয়া পড়তে হবে:

আয় আল্লাহ! তুমি এ কোরবানি আমার পক্ষ থেকে কবুল কর যেমন তুমি তোমার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ (সা.) এবং তোমার খলীফা ইব্রাহীম (আ.)-এর কোরবানি কবুল করেছিলে।

কোরবানির ফজিলত

নবি করিম (সা.) কোরবানির ফজিলত ও অসংখ্য সওয়াবের কথা উল্লেখ করে বলেন:

১. জিলহজ মাসের ১০ তারিখে কোরবানির রক্ত প্রবাহিত করা থেকে ভালো কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছু নেই। কিয়ামতের দিন কোরবানির পশু তার শিং, পশম ও ক্ষুরসহ হাজির হবে। কোরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়। অতএব মনে আগ্রহ সহকারে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে কোরবানি করো। [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ্]

২. সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবি (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ কোরবানি কি বস্তু? নবি বলেন, এ তোমাদের পিতা ইব্রাহিম (আ.)-এর সুন্নত। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এতে আমাদের জন্য কি সওয়াব রয়েছে? নবি (সা.) বলেন, তার প্রত্যেক পশমের জন্যে এক একটি সওয়াব পাওয়া যাবে। [তিরমিযি, ইবনে মাজাহ]

৩. হজরত আবু সাঈদ খুদরী (র.) বলেন যে, নবি (সা.) হজরত ফাতেমা (রা.) কে বলেন, ফাতেমা তোমার কোরবানির পশুর কাছে দাঁড়িয়ে থাক। এজন্যে যে, তার যে রক্ত কণা মাটিতে পড়বে তার বদলায় আল্লাহ তোমার পূর্বের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। হজরত ফাতেমা (রা.) বলেন, এ সুসংবাদ কি তাহলে বায়েতের জন্য নির্দিষ্ট, না সকল উম্মতের জন্যে? নবি বলেন, আমাদের আহলে বায়েতের জন্যেও এবং সকল উম্মতের জন্যেও [জামেউল ফাওয়ায়েদ]।

৪. হজরত ইবনে বারীদাহ্ (রা.) তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বলেন, নবি (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খেয়ে নামাজে যেতেন না। আর ঈদুল আজহার দিন নামাজের আগে কিছু খেতেন না [তিরমিযি, আহমাদ]। তারপর নামাজ থেকে ফিরে এসে কোরবানির পশুর রান্না করা কলিজা খেতেন।

ঈদুল আজহা মানব সভ্যতায় ত্যাগের মহিমা প্রতিষ্ঠায় প্রবল ভূমিকা রাখে। ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ। তাই আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণই হোক কোরবানির উদ্দেশ্য।

মুহাম্মদ ইসমাঈল: কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

জাতির পিতার পরিবেশপ্রেম

সাধন সরকার

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ জাতির পিতার জীবন ও সংগ্রাম। তাঁর কণ্ঠে বাঙালি জাতির হাজার বছরের মুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। বাঙালির লালিত সুখ-স্বপ্ন, দুঃখ-কষ্ট, সর্বোপরি আবহমান বাংলার বৈশিষ্ট্যকে তিনি নিজের জীবনে আত্মস্থ করেছেন। জাতির পিতা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রকৃত অর্থে সার্থক রূপ দিয়েছেন। তিনি আমাদের চিন্তাচেতনা ও মননে বাঙালি জাতীয়তাকে গেঁথে দিয়েছেন। শত্রুপক্ষের বঞ্চনা, নিপীড়ন, অবিচার থেকে বাঙালি জাতিকে রক্ষা করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কোনো কিছুই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু সকল কর্মকাণ্ডে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র–এই চার নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গঠনে কল্যাণমূলক ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি দেশের পরিবেশ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নানামুখী কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আমরা এখন যেটা উপলব্ধি করছি সেটা তিনি তাঁর সময়ে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর এক একটি চিন্তার কাছে গেলে মনে হয় তখনকার সময়ে এখনকার সময়গুলো তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা ছিল তাঁর দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের অন্যতম। সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ১৯৭৩ সালে 'Bangladesh Wildlife (Preservation) Order 1973 অধ্যাদেশ জারি করেন। দেশের বন্যপ্রাণী বাঁচাতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার তাগিদে ১৯৭৪ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। মূলত এই আইনের মাধ্যমে দেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে এক নব অধ্যায় সূচিত হয়। তিনি নদনদী, খালবিল, প্রকৃতি-পরিবেশকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। নদীর প্রতি ছিল জাতির পিতার অসামান্য দরদ। তাঁর বিভিন্ন ভাষণ ও লেখনীতে নদী অভিজ্ঞান ও নদী দর্শন ফুটে উঠেছে। তিনিই ১৯৭২ সালে 'যৌথ নদী কমিশন' গঠন করে প্রথম পানি কূটনৈতিক কার্যক্রম আরম্ভ করেন। স্বাধীনতা লাভের পরপরই তিনি নদীর নাব্য সংকট দূরীকরণে ড্রেজার সংগ্রহ করেন। এছাড়া নৌপথ উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি বহুমাত্রিক কর্মপরিকল্পনা হাতে নেন।

তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালে দেশে 'ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম' প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে খুব কম সময় পেলেও তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। এর মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি বৃক্ষরোপণে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণভবন, বঙ্গভবনসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে গাছ লাগান। পাশাপাশি তিনি দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের ফলে বৃক্ষসম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করার জন্য সারা দেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু করেন। তিনি মহাসড়কের পাশে, বাসাবাড়ির চারপাশে, পতিত জমিতে সবাইকে বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানান। তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়দৌড় বন্ধ করে গাছ লাগিয়ে সুদৃশ্য উদ্যান তৈরি করেন, যার নাম দেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজরিত সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এখন নগরবাসী ও আশপাশের মানুষের একদণ্ড বুক ভরে নিশ্বাস বিলিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাঙালির হাত ধরেই সূচনা হয় উপকূলে বনায়ন কর্মসূচি, যেটাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ সার্বিক বনায়ন বৃদ্ধিতে অনেক দূর এগিয়েছে। জানা যায়, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে তিনি বাংলাদেশ বনশিল্প করপোরেশনকে জাতীয়করণ করেন এবং এর আধুনিকায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু সরকার পরিবেশের পাশাপাশি গ্রাম উন্নয়নের এক সামষ্টিক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিতে সেচ ও সারের ব্যবহার বৃদ্ধি, শস্য উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রাম সমবায়, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, গ্রামীণ সার্বিক পরিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি।

তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি দেশ পুনর্গঠনে যে সামান্য সময় পেয়েছিলেন, এই সামান্য সময়কে অসামান্য করে তুলেছিলেন তাঁর অফুরন্ত জীবনীশক্তি দ্বারা। দেশব্যাপী এখন যে বৃক্ষ আন্দোলন, প্রতিবছর জুন মাসে বৃক্ষরোপণের যে উৎসব এবং বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়, তার স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন

বঙ্গবন্ধুই। তাঁর লেখা *কারাগারের রোজনামচা* বইয়ে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সালের কারাস্মৃতি থেকে জানা যায়, জেলখানার বাগান ও গাছপালার সাথে বঙ্গবন্ধুর এক ধরনের ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। জেলখানায় অবাধে প্রবেশ করা পশুপাখি তাঁর সাথি হয়ে গিয়েছিল। এক জোড়া হলুদ পাখির কথা কী সুন্দরভাবে তাঁর লেখনীতে ফুটে উঠেছে তা সত্যিই অকল্পনীয়। *কারাগারের রোজনামচা'র* (পৃ.-১৬৬) ১৯৬৬ সালের ১৭ই জুলাইয়ের ঘটনায় তিনি লিখেছেন, 'বাদলা ঘাসগুলি আমার দুর্বার বাগানটা নষ্ট করে দিতেছে। কত যে তুলে ফেললাম। তুলেও শেষ করতে পারছি না।' জেলের মধ্যে বন্দি থেকেও তিনি প্রকৃতি-পরিবেশকে ভালোবেসেছেন। প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষায় টান অনুভব করেছেন। তিনি ১৯৭৪ সালে বৃক্ষরোপণ অভিযান উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে বিভিন্ন আহ্বান জানান। এ আহ্বানে তিনি গাছ লাগিয়ে বৃক্ষসম্পদ সম্প্রসারণের কথা বলেন। তিনি বৃক্ষরোপণের সময় ও পরবর্তীতে অধিক বৃক্ষরোপণ করে সরকারের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার কথা বলেন। তিনি দেশের জনপ্রতিনিধি, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, সমাজসেবী ও আপামর জনসাধারণের কাছে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সবাইকে এগিয়ে আসতে বলেন। তাঁর দেখানো পথেই দেশের কোটি কোটি মানুষ বৃক্ষ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখে। বৃক্ষরোপণে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়। হয়ত তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব তখন থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন! এখন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ যে সারা বিশ্বে প্রশংসা কুড়াচ্ছে, এর শুরুটা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। তিনিই সর্বস্তরে বৃক্ষরোপণের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এখন বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন বেড়েই চলেছে। এটা বঙ্গবন্ধুরই অবদান। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অনেক নারিকেল গাছ বঙ্গবন্ধুর হাতে লাগানো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় তাঁর স্মৃতিবিজরিত কয়েকটি নারিকেল ও হিজল গাছ দেখা যায়। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিধন্য আমগাছটিকে গোপালগঞ্জের শতবর্ষী বৃক্ষ হিসেবেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে!

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর গৃহীত বহুমুখী কর্মকাণ্ড চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। সর্বপ্রথম তিনিই দেশের হাওর-বাঁওড়, নদনদী ও অন্যান্য জলাভূমি উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। বঙ্গবন্ধুর লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী'*তে তাঁর শৈশবের কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে মধুমতী নদীকে ঘিরে। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধ এবং তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আরেক ছোট্ট নদী বাঘিয়া (টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক ভিটার পাশ ঘেঁষে প্রবাহিত)। বাঘিয়া নদীতে কেটেছে বঙ্গবন্ধুর শৈশব-কৈশোরের দিনগুলো। শিশু মুজিব এই নদীতেই সাঁতার কেটেছেন, গোসল করেছেন, বৈকালিক হাওয়া খেয়েছেন, নিশ্বাস নিয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি মাটি, পানি ও বায়ুর যাতে দূষণ না ঘটে সে ব্যাপারে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গীয় বদ্বীপের এই উর্বর মাটি যাতে কোনোভাবেই দূষিত না হয় সে ব্যাপারে জমিতে কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কথা বলতেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে 'Water Pollution Control Ordinance 1973' জারির মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সূচনা করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু বৃক্ষরোপণের যে ডাক দিয়েছিলেন, তাঁর এই দূরদর্শী ভাবনা বর্তমান সময়ে এসে কতটা সমসাময়িক, যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য তা বলে শেষ করা যাবে না। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে ভুগছে পুরো বিশ্ব। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উপকূলীয় দেশসমূহ রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে প্রথম সারির দিকে। তবুও বাংলাদেশ নিজস্ব প্রচেষ্টায় জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে।

দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সামাজিক আন্দোলন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ কালের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁকে দিয়েছে অমরত্বের গৌরব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের নদনদী রক্ষা, বৃক্ষসম্পদ বৃদ্ধিসহ সর্বোপরি প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণের যে ডাক দিয়েছিলেন তা দেরিতে হলেও সফলতা পেয়েছে। এসব কাজে প্রকৃতি-পরিবেশপ্রেমীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সময়ে চালু করা হয়েছে জাতীয় পরিবেশ পদক, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন, বঙ্গবন্ধু নদী পদক ইত্যাদি। এ ছাড়া গত আড়াই দশকে প্রকৃতি-পরিবেশ সংরক্ষণে বহু নীতি, আইন ও বিধিমালা চালু করা হয়েছে। সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ, যেখানে বলা হয়েছে– 'রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন'। যদিও পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার পেয়েছেন। জাতির পিতা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী'*র শুরুতে লিখেছেন, 'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।' এই ভালোবাসা নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক তরুণকে যার যার অবস্থান থেকে বঙ্গবন্ধুর দেখানো নীতি, আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসা মানে দেশ, মাটি, মানুষ ও এ দেশের প্রকৃতি-পরিবেশকে ভালোবাসা। জাতির পিতা উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। রূপকল্প-২০৪১ (উন্নত দেশ) বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মেনে তাঁর দেখানো পথেই কাজ করে চলেছে শেখ হাসিনার সরকার। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। অবশ্য প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সে দিন বেশি দূরে নয়, যে দিন বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে উন্নত দেশ হিসেবে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করবে।

সাধন সরকার: শিক্ষক, লৌহজং বালিকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ ও পরিবেশকর্মী, sadonsarker2005@gmail.com

দুর্নীতিকে না বলুন

রুখবো দুর্নীতি, গড়বো দেশ
হবে সোনার বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কবি সুফিয়া কামাল

সুফিয়া কামালের কবিতায় বঙ্গবন্ধু

কাজী সুফিয়া আখ্‌তার

বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক, আর্থসামাজিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী কবি সুফিয়া কামাল এই ভূখণ্ডের মৃত্তিকার ঘ্রাণ আজীবন ভালোবেসে বুক ভরে নিয়েছেন। সে দিনের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির আরাধ্য 'বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন তাঁর দুচোখে, অন্তরের গভীরে, সমগ্র জীবনের কর্ম-চিন্তা-সংগ্রাম-আন্দোলনে প্রোথিত করেছিলেন, জীবন উৎসর্গ করেছিলেন; তেমনি সুফিয়া কামালও নিজের মতো করে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সকল মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলময় উন্নত জীবন কামনা করতেন। এই লক্ষ্যে সকল প্রকার বৈষম্যহীন, সমতাপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন বলে আমৃত্যু মাথা উঁচু করে কাজ করেছেন, ভয়হীন চিত্তে সংগ্রাম ও আন্দোলন করেছেন। অনেক রাজনীতিবিদের সঙ্গে তাঁর ভালো হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁকে বড়ো বোনের মতো শ্রদ্ধা করতেন। বঙ্গবন্ধুর পুত্র-কন্যারা তাঁকে ফুপু বলে সম্বোধন করতেন। সম্মান করতেন। রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও সুফিয়া কামাল তাঁকে ভীষণ পছন্দ করতেন।

নারীনেত্রী কবি সুফিয়া কামাল কখনো রাজনীতি করেননি। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যও ছিলেন না। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ-এর অনেকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অনেকের সঙ্গে নিকট আত্মীয়ের মতো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তিনি দলীয় রাজনীতিতে ইচ্ছে করেই কখনও নিজেকে জড়াননি। মানুষের জীবনমান উন্নয়নে, একটি সমতাপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় রাজনীতির গুরুত্ব তিনি গভীরভাবে বুঝতেন এবং উপলব্ধি করতেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে রাজনীতি ও মানবিক নেতা অতি গুরুত্বপূর্ণ– এ কথা মনপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি স্বয়ং সংগ্রাম, আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক কুসংস্কার দূর হবে– এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আজীবন বহুমাত্রিক আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে ছিলেন। প্রতিনিয়ত চারপাশের লোকজনকে, পিছিয়ে পড়া নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত করতে, তাদের মনে চেতনা সঞ্চারিত করতে। তিনি ছিলেন বাহান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের, মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ঝঞ্ঝামুখর দুর্জয় ক্ষণের অন্যতম নেত্রী। মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর লেখা *একাত্তরের ডায়েরী* সমকালীন অনেক ঘটনা, মুক্তি বোধ, মুক্তির শপথ, মানবিকতায় সমৃদ্ধ নানা তথ্য, ব্যক্তিগত শোক-দুঃখের রক্তে লেখা অনবদ্য গাথা। এটি এ দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল তার একটি ঐতিহাসিক দলিল, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর লেখা অনেক কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিধৃত। একাত্তরের জানুয়ারি মাসের ২৪ তারিখে তিনি লিখেছেন–

এবার জেগেছে এই দেশে
রক্তাক্ত হৃদয় হতে আলোক কমল
আত্মচেতনার রঙে মেলি শতদল
বিথারি উঠেছে এতদিনে
এইবার পথ নিবে চিনে।
ঊনসত্তুরের সেই দিন শেষে আজ
সংগ্রামী সেনারা তোলে নতুন আওয়াজ।'
[মোর যাদুদের সমাধি পরে]

নিজের দুই কন্যাকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন। যুদ্ধ চলাকালীন তিনি কোথাও আত্মগোপন করেননি। গাছগাছালিতে ছাওয়া সাঁঝের মায়ায় নিজস্ব গৃহে দীর্ঘ নয় মাস বাস করে চিন্তাযুক্ত মনে, মুক্তির প্রার্থনাসহ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতায় কাজ করেছেন নির্ভীকভাবে। একই বছরে ২৩শে জুন তিনি তাঁর রচিত 'আমরা নেমেছি সংগ্রামে' কবিতায় লিখেছেন–

আমরা নেমেছি সংগ্রামে
পূর্বাশা আলো দিগন্তে আসে অমানিশীথের শেষ যামে।
ওরা মারিয়াছে মানুষ, আমরা পশুরে মারিয়া করিব শেষ,
লাখো শহীদের রক্তে রাঙানো এই আমাদের বাংলাদেশ
এবার লভিবে মুক্তি! জয়!

গভীর প্রত্যয়ে তিনি একই কবিতার শেষাংশে উচ্চারণ করেছেন–

নেমেছি আমরা সংগ্রামে,
জয়ী হবো মোরা সংগ্রামে।
পূর্ব গগনে আলোর আভাস: পশ্চিমে ওই আঁধার নামে,
হবো জয়ী মোরা এ সংগ্রামে।

দেশের জন্য যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা অমর। তাঁদের উদ্দেশে তিনি লেখেন–

যারা মরণ ভয়কে জয় করেছে
তাদের আবার মারবে কারা?
ওরা মারতে এসে মরণ দেখে
ভয় পেয়ে হয় দিশেহারা।

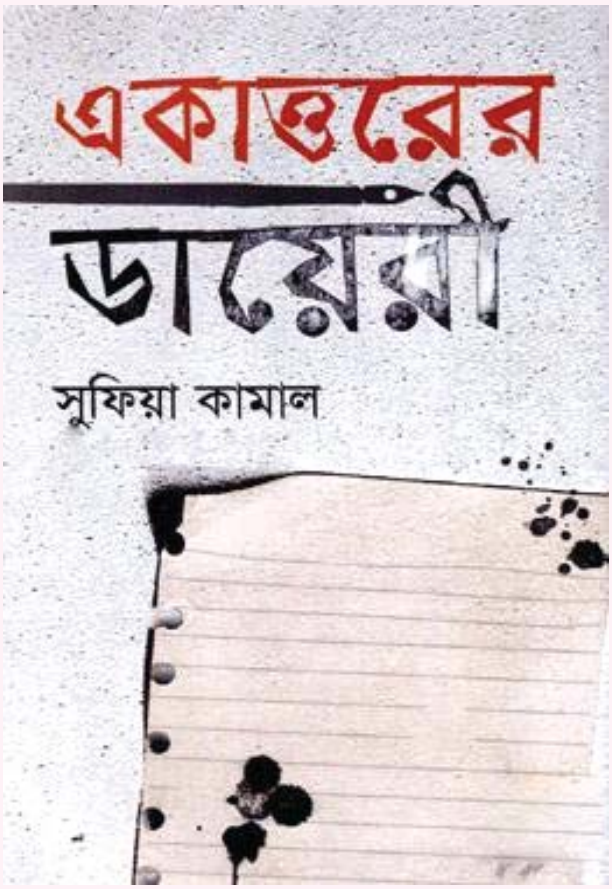

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের স্রষ্টা। বাঙালির জন্য পৃথক রাষ্ট্রের চিন্তা-চেতনা বিষয়টি নতুন। তাই কবি সুফিয়া কামাল ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জাতির চিরস্মরণীয়-বরণীয় নেতার জন্মদিনে রচিত তাঁর 'মুজিবের জন্মদিনে' কবিতায় নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেন–

তব জন্মক্ষণ
একক তোমার নহে। নিপীড়িত লক্ষ জনগণ
নবজন্ম লভি চেতনার
তোমারে লভিয়া কাছে হয়েছে দুর্বার।

তিনি তাঁকে অগ্রনায়ক, নিরস্ত্রের নেতা, লোভ-স্বার্থ-হিংসাহীন একনিষ্ঠ বীর উল্লেখ করে তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছেন। তাঁকে শতায়ু হওয়ার আশীর্বাদ করে লিখেছেন–

হে সংগ্রামী! সাহসী নির্ভীক!
তব জয়ধ্বনি দিক দিক
প্লাবিয়া উঠেছে ঊর্ধ্বাকাশে
পীড়ক শাসক তাই শঙ্কিত হৃদয়ে কাঁপে ত্রাসে।
লোভ-স্বার্থ-হিংসাহীন একনিষ্ঠ বীর!
দাঁড়ায়েছ উঁচু করি শির।
সে শিরে বর্ষুক অহর্নিশ
বিধাতার মঙ্গল আশীষ!
শতায়ু হইয়ো তুমি, কেটে যাক্ শঙ্কা ও সংশয়,
এ মাটির সুসন্তান হোক্ তব জয়!

সর্বজন প্রিয় কবি সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদের নবাব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সৈয়দ আবদুল বারি ছিলেন আইনজীবী, ভাষাপণ্ডিত ও সুফি ঘরানার আধ্যাত্মিক সাধক। শিশুকালেই তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। মা নবাবজাদী সৈয়দা সাবেরা খাতুন।

সুফিয়া কামাল স্বশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তিনি সারাজীবন মানব উন্নয়নে, বিশেষ করে, নারী ও শিশুদের উন্নয়নে কাজ করেছেন। আমাদের তো তাঁর দেখানো পথেই চলতে হবে। বাংলাদেশ ও সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, বৈষম্য দূর করতে হবে।

কবি সুফিয়া কামালের শুভ জন্মদিনে তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কাজী সুফিয়া আখ্‌তার: নারী আন্দোলন কর্মী ও গবেষক

দেশের ২৯তম গ্যাসক্ষেত্র 'ইলিশা'

ভোলা জেলার ইলিশা-১ কূপটিকে দেশের ২৯তম গ্যাসক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন এই কূপে মজুদ প্রায় ২০০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। দৈনিক গড়ে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট করে গ্যাস উত্তোলন করা যাবে। সেই হিসাবে ২৫ থেকে ২৬ বছর গ্যাসক্ষেত্রটি থেকে গ্যাস পাওয়া যাবে। ২২শে মে ২০২৩ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ রাজধানীর বারিধারায় তার বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ সব তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ভূতাত্ত্বিক তথ্য এবং ডিএসটি (ড্রিল স্টিম টেস্ট) রিপোর্ট অনুযায়ী, ইলিশা-১ কূপে গ্যাসের সম্ভাব্য মজুদ প্রায় ২০০ বিলিয়ন ঘনফুট (বিসিএফ)। দৈনিক গড় ২০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন বিবেচনায় কূপটি থেকে ২৫-২৬ বছর গ্যাস উৎপাদন সম্ভব হবে। ইলিশা-১ কূপে গ্যাসের উল্লিখিত মজুদ বিবেচনায় গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ হাজার ৭৪৪ কোটি টাকা। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে এলএনজির বিদ্যমান মূল্য হিসাবে ইলিশা-১ কূপে গ্যাসের মজুদ (২০০ বিলিয়ন ঘনফুট) বিবেচনায় গ্যাসের আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৬ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, এটি হবে ভোলা জেলার তৃতীয় গ্যাসক্ষেত্র। অন্য দুটি হলো শাহবাজপুর ও ভোলা নর্থ গ্যাসক্ষেত্র। ভোলায় তিন গ্যাসক্ষেত্র (শাহজাদপুর, ভোলা নর্থ ও ইলিশা) মিলে ২ দশমিক ২৩ টিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে। সেখান থেকে প্রতিদিন ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন সক্ষম।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গ্যাজপ্রম বাপেক্সের হয়ে কূপটি খনন করে। গত মার্চে ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা ইউনিয়নের মালের হাটসংলগ্ন এলাকায় খননকাজ শুরু হয়। তিন হাজার ৪৭৫ মিটার গভীর পর্যন্ত খননকাজ শেষ হয় ২৪শে এপ্রিল।

প্রতিবেদন: অনিল বিশ্বাস

বৃক্ষরোপণ

শওকত জাহান

সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ অপূর্ব দক্ষতায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। পরম মমতায় তিনিই সৃষ্টি করেছেন অরণ্য বা বনভূমি। 'বৃক্ষবন্দনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উক্তি করেছিলেন–

> অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
> প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ;
> ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
> ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ পরে;

এই যে আদিপ্রাণ বৃক্ষ, এরই সমারোহকে অরণ্য বা বনভূমি বলা হয়। মানুষ সৃষ্টির পূর্বে এই পৃথিবী অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। আদিম মানব-মানবী যেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে পদার্পণ করেছিল সেদিন হয়ত এই বৃক্ষরাজিই অবাক বিস্ময়ে তাদের স্বাগত জানিয়েছিল। বৃক্ষই পৃথিবীর প্রথম আগন্তুক। তাই সে মানুষের নিকটতম প্রতিবেশী। মানুষের আগমনের পূর্বেই সে পৃথিবীতে এসে মানুষের খাদ্য ও মাথা গুজবার শীতল ছায়া সৃষ্টি করে অপেক্ষা করছিল মানুষের আবির্ভাবের। অরণ্য তার অবারিত শ্যামল ছায়া বিস্তার করে তাকে সূর্যের দহন জ্বালা থেকে রক্ষা করেছিল। মানুষকে প্রথম বাসস্থান ও খাদ্য এই বনভূমিই দিয়েছিল। প্রাণের ধাত্রী বিশুদ্ধ অক্সিজেন এবং প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দিয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু সারা বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের আশ্রয় ও খাদ্যের জন্য কৃষিকাজের প্রসারেও পৃথিবীকে বৃক্ষহীন করতে হয়েছে। মানুষ উন্নত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে বনভূমির ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেছে। গড়ে উঠেছে নগর-বন্দর, বাড়িয়েছে চাষবাসের জায়গা। কৃতঘ্ন মানুষ তার পরম হিতৈষী অরণ্যের বিরুদ্ধে কুঠার ধারণ করে পৃথিবীকে বৃক্ষহীন করতে দ্বিধা বোধ করছে না। অরণ্যকে হত্যা যে আত্মহত্যারই নামান্তর, এতে যে একদিন মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে, সেই শুভবোধটি আজ মানুষের মধ্যে জেগে উঠেছে। তাই দেশে দেশে আজ বৃক্ষরোপণের বিষয়ে সবার মনোযোগ লক্ষ করা যাচ্ছে।

গবেষকদের মতে, পৃথিবীতে স্থলভাগের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ অঞ্চলে এক সময় বনভূমি ছিল। কিন্তু মানুষ তার নানা প্রয়োজনে বন উচ্ছেদের ফলে এখন পৃথিবীর মাত্র ২৭ ভাগ বনাঞ্চল অবশিষ্ট রয়েছে। শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই একই অবস্থা।

এ যুগে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ প্রকৃতির নানা বিরূপতা লক্ষ করে গুরুত্বসহকারে বনভূমির উপকারিতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। প্রত্যক্ষ উপকারিতার অন্যতম হলো কাঠ শিল্পের প্রসার। বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা কাঠের সাহায্যে পৃথিবীতে নানা দেশে নানা শিল্প গড়ে উঠেছে। এ সব শিল্পের মধ্যে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে জাহাজ ও রেলগাড়ির অংশাদি, গৃহনির্মাণ, বাক্স প্রস্তুত ইত্যাদি। এ ছাড়া সংগৃহীত কাঠের শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ব্যবহৃত হয় জ্বালানির কাজে। শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগে কাঠ-কয়লা। কাঠমণ্ড, কাগজ, রেয়ন, প্রভৃতির কাঁচামাল হিসেবে কাঠের ব্যবহার আজ জগৎজুড়ে। বনভূমি থেকে সংগৃহীত উপজাত দ্রব্যের সংখ্যাও অজস্র। এদের মধ্যে পড়ে– লাক্ষা, ধুনা, কুইনাইন, কর্পুর, রাবার, তার্পিন তেল ইত্যাদি। বনভূমিকে ভিত্তি করে মোম, মধু ইত্যাদি বিভিন্ন বনজ শিল্পের প্রসার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বনভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চলে গবাদি পশুপালন। সর্বোপরি মানুষ ও অরণ্যের আদান-প্রদানের সম্পর্ক অতি নিবিড়। অরণ্য জীবজন্তু ও পাখপাখালির আবাসস্থলও। পাখির কূজন, সুর বনের চারদিকে মুখরিত করে রাখে, মানুষের মনকে এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে দেয়। এককথায় সভ্যতার প্রসার, অগ্রগতিতে বনজসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। পরোক্ষভাবেও বনভূমি মানুষের উপকার করে থাকে। বনভূমি জলবায়ুকে প্রভাবিত করে, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বাড়ায়। এ কারণে অরণ্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আধিক্য। মাটির ক্ষয় রোধে বনভূমির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। গাছপালার শিকড় মাটির কণাগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। প্রচণ্ড ঝড়ের গতিবেগ প্রতিরোধ করে বহু সময়ই সে আমাদের রক্ষকের ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপকূলীয় বনভূমি ঝড়, ঝঞ্ঝা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ের গতিবেগ থেকে রক্ষা করে। আমাদের খুব কাছে থেকে সুন্দরবন বাংলাদেশ, ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে দেশকে, দেশের মানুষকে বাতাসের গতিবেগকে রোধ করে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করে। প্রচণ্ড ঝড়ের জৈব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই জুন ২০২৩ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা' এবং 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা'র উদ্বোধন উপলক্ষে গণভবন প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করেন –পিআইডি

পদার্থ সাহায্য করে বনভূমির মাটির উর্বরা শক্তি বাড়াতে। এ ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণে, মরুভূমির প্রসার রোধে, কর্মসংস্থানে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে বনভূমি বিরাট ভূমিকা পালন করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে এই বনভূমি যেমন দেশকে রক্ষা করে, মরুভূমির প্রসারেও সে বাধা দিয়ে থাকে। পৃথিবীর উষ্ণায়ন কমাতে বনভূমির ভূমিকা বিরাট ও ব্যাপক।

অরণ্য হরণ আত্মহননেরই নামান্তর। কেননা অরণ্যের অভাবে এই বিশ্বে মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে– এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। মানুষ তার নিশ্বাসে ও নানা দহন ক্রিয়ায় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি করে চলে অরণ্য তা গ্রহণ করে ফিরিয়ে দেয় মানুষের প্রাণধারণের পর্যাপ্ত অক্সিজেন।

এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে, জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপের ফলে বাংলাদেশে তো বটেই পৃথিবীর আরও নানা দেশের অরণ্য সম্পদ ক্রমেই ধ্বংস হচ্ছে। জনগণ ও বনভূমির মধ্যে আজ আর আত্মিক সম্পর্ক রক্ষা করা যাচ্ছে না। মানুষ তার প্রয়োজনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বনভূমিকে সে নির্বিচারে ধ্বংস করছে। যার ফলে বিশ্বের আবহাওয়াতেও বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বন্যা, খরা নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে মানুষ দিশেহারা। পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। যার ফলে কৃষিভূমিতে ফসল ফলাতে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু সুরক্ষায় এবং সেই সঙ্গে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। যে-কোনো দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ সুস্থ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার জন্য দেশের আয়তন অনুপাতে ২৫ শতাংশ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক। দেশে বর্তমানে বনভূমির আয়তন প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর– যা মোট ভূখণ্ডের মাত্র ১৫.৫৮ শতাংশ। এটি একটি দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের অতি প্রয়োজনে গত ৫০ বছরে দেশের মোট আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে দুর্বৃত্তরা অবৈধভাবে বন উজাড় ও অবৈধভাবে দখল করে নির্মাণ করেছে শিল্পকারখানা, ইটভাটা, পর্যটন কেন্দ্র, কৃষি ও ঘরবাড়ি।

বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো যে বনটি রয়েছে, তা হলো সুন্দরবন। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও খুলনা অঞ্চলে বনভূমি রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইডেন, ফিনল্যান্ডে বনভূমির শতকরা পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৫০, ৩০, ৩৫, ৭০, ৫০ ভাগ।

আমাজনের অরণ্য বিশ্ব মানবের নিঃসরিত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে বিশ্বকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখছে। আমাজন পৃথিবীর ফুসফুস। কিন্তু সেই আমাজন ২০২০-এ পুড়তে শুরু করল। বিশ্বের সকল মানুষ এতে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। আমাজন যেমন পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে বনাঞ্চল রয়েছে তা শুধু সে দেশেরই মঙ্গল বয়ে আনবে– তা নয়। ক্ষুদ্রের সমষ্টিই বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনবে। তাই প্রতিটি দেশকে বনভূমি সংরক্ষণ ও পরিচর্যায় যত্নশীল হতে হবে।

এ যুগে নতুন করে চিন্তাভাবনা চলছে অরণ্যের উপকারিতা নিয়ে। বন সংরক্ষণের বিষয়ে এ যুগে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতি জুন মাসে পালিত হচ্ছে বৃক্ষরোপণ অভিযান। ভারতে যেটি বন মহোৎসব নামে পালিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই আধুনিক ভারতে বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রথম প্রবর্তক। প্রকৃতির সান্নিধ্যে শিক্ষার্থীরা প্রাণের স্পর্শ পাবে ও শিক্ষালাভ করবে– এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই শহর থেকে বহুদূরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন গড়ে তোলেন। প্রকৃতির কোলে থেকে তারা প্রকৃতিকে ভালোবাসবে– এটিই ছিল তাঁর স্বপ্নসাধ।

বনের মধ্যে শিক্ষাঙ্গন তৈরি করে কবিগুরু গেয়েছিলেন–

> মরুবিজয়ের কেতন ওড়াও হে প্রবল প্রাণ।
> ধুলিরে ধন্য কর করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ॥

কবিগুরুর এ প্রার্থনাকে স্বীকৃতি দিয়ে উভয় বাংলাতেই বনভূমি সৃজনে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। অরণ্যই প্রাণের অগ্রদূত। জনসংখ্যার আধিক্য ও যন্ত্রসভ্যতার ক্রমবিস্তার এবং অরণ্য সংহারে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এখন বন সৃজনই একমাত্র উপায়, যা দেশকে মরুকরণের এবং উষ্ণায়নের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে পারে।

সুন্দরবন বাংলাদেশ ও ভারতের সর্ব দক্ষিণে অবস্থান করে

সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এ বনাঞ্চল একদিকে যেমন বাংলাদেশের অহংকার, তেমনি বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। বার বার সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, ঝড়-ঝাপ্টা থেকে বনবাসী ও তৎসংলগ্ন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দাদের রক্ষা করে থাকে। অবশ্যই স্মরণীয় যে, বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সুরক্ষাকবচও বটে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশকে যেমন রক্ষা করে, তেমনি বন্যপ্রাণীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলও। এখানকার রয়েল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবী বিখ্যাত।

একদা দেশের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ভাওয়াল ও মধুপুরের গড় এক বিস্তীর্ণ বনভূমি ছিল। কিন্তু এ বনভূমি লোকালয়ের নিকটবর্তী হওয়াতে এলাকার অধিবাসীরা নানা প্রয়োজনে বনাঞ্চলকে উজাড় করে দিচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। এ দেশের পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের বনভূমিও উল্লেখযোগ্য।

শুধু একটি বা কয়েকটি দেশ নয় বরং গোটা বিশ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ু সুরক্ষায় বনাঞ্চল ও সেইসঙ্গে জীববৈচিত্র্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ক্রমাগত এই বনাঞ্চল ধ্বংসের পরিণতি কতটা ভয়াবহ ও দুর্বিষহ হতে পারে, তা বোধ করি আমাদের চিন্তার মধ্যে নেই।

বর্তমান মানুষ বনাঞ্চল ধ্বংসের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে সচেতন হয়েছে। তাই যে বৃক্ষ প্রকৃতিরই সৃষ্টি ছিল, আজ তা রোপণ করে বনায়নের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। বিশ্বের উষ্ণায়ন ক্রমাগত যে হারে বাড়ছে তাতে প্রযুক্তি সহায়ক হতে পারে, কিন্তু সেটিই সব নয়। উষ্ণায়ন কমাতে বনাঞ্চল ধ্বংস অবশ্যই রুখতে হবে। ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ১৯২৭ সালের বন আইনের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসে। সামাজিক বনায়নকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ২০০৪ সালে সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করে।

পরিবেশ বিপর্যয়কে বিজ্ঞানীগণ গ্রিন হাউজ ইফেক্ট নামে চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে সূর্য রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে আসছে এবং পৃথিবীতে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন, পানি এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে একটি প্রাত্যহিক ভারসাম্য ও সম্পর্ক রয়েছে। যা ইকোসিস্টেম বলে পরিচিত। এ অবস্থার ব্যতিক্রম হলে শুধু প্রকৃতি নয়, গোটা পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী মাইকেল মালিকফার ইস্টার্ন রিভিউতে বলেন, আগামী শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের এক দশমাংশ এলাকা পানিতে তলিয়ে যাবে। অন্য এক পরিবেশ বিজ্ঞানী বলেন, ক্রমাগত বন ধ্বংসের ফলে ২০৩০ সাল নাগাদ এ দেশের ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে উষ্ণায়নে মানুষের জীবনযাপন কঠিন হবে। তাই বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়নের দিকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ২০০০ সালে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে ২০২৭ সালের আইনের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আইন কাঠামোতে নিয়ে আসে। পৃথিবীর উষ্ণায়ন কমাতে বন বিনাশ রোখা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। বনবিভাগের নানা শাখায় কর্মরত সরকারি ব্যক্তিবর্গ, বেসরকারি ব্যক্তিগণ অবশ্যই নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে বনায়নে সহযোগিতা পালন করছেন। বনের উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের মাত্রা কমাতে সাধারণ জনগণ, সরকারি লোকজন– সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দেশে বনভূমিকে আবার সবুজায়ন করা যাবে। দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। সর্বোপরি দেশের অপামর জনগণকে এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম– এক কথায় সমগ্র বাংলাদেশের জনগণকে এ বিষয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে।

নদনদী রক্ষায় সরকার যেমন কঠিন ভূমিকা পালন করছে, তেমনি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও যদি সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে কঠিন মনোভাব নিয়ে উদ্যোগী হয়, তবে বনভূমির বিনাশ নয়, বনভূমি সৃষ্টির দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে দেশের মানুষ রক্ষা পাবে।

যে দেশের জনগণ রক্তপাত করে ভাষাকে অর্জন করেছে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দিতে পারে, সে দেশের আমজনতা জেগে উঠলে পুরানো বনাঞ্চল রক্ষা করে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করে এ দেশের সবুজ বিপ্লবকে তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে নিঃসন্দেহে। এ দেশের চারদিকে আবার সবুজ-শ্যামলে ভরে উঠবে। চারদিকে পাখপাখালি মুখরিত হবে। জাতির পিতার স্বপ্ন সার্থক হবে– এটি কোনো অলীক স্বপ্ন নয়, নিতান্তই বাস্তব। সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হই। আসুন, বৃক্ষরোপণ করি।

শওকত জাহান: প্রধান শিক্ষক, রাজধানী আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং প্রাক্তন সহ-প্রধান, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা, ric08.rampura@gmail.com

ঢাকায় নতুন মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি উদ্বোধন

ঢাকায় ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে একটি নতুন মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি ৩০শে মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা যৌথভাবে উদ্বোধন করেন।

হাইকমিশনার জানিয়েছে, গ্যালারিটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ গল্প, ছবি ও নথি প্রদর্শন করার মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের সাক্ষ্য বহন করবে। দর্শণার্থীদেরকে দুই দেশের ইতিহাসের অভ্যন্তরে একটি অনুপ্রেরণামূলক ভ্রমণের সুযোগ করে দেবে এবং বাংলাদেশের জনগণের বীরত্ব, প্রাণোচ্ছলতা ও অদম্য চেতনার প্রতীক হিসেবে কাজ করবে। গ্যালারিটি সূক্ষ্মভাবে কিউরেট করা বিপুল সংখ্যক প্রদর্শনীসামগ্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইকারীদের সাহসিকতা, সংকল্প ও আত্মত্যাগকে তুলে ধরে। এটি নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং জীবন উৎসর্গকারী অজ্ঞাতনামা লাখো মানুষের স্মৃতিকে সম্মান জানায়।

হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন, গ্যালারিটি ১৯৭১ সালের চেতনাকে রক্ষা ও উদযাপন করতে ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ অঙ্গীকারকে তুলে ধরবে– যা আমাদের সম্পর্ককে দিক নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। হাইকমিশনার ভার্মা আশা প্রকাশ করেন গ্যালারিটি ভারত-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের একটি স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে কাজ করবে– যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেখতে আসবে এবং অনুপ্রেরণা পেতে থাকবে।

প্রতিবেদন : ইশরাত হক

পদ্মা সেতু ও রেল সড়কের পাশে সবুজ বলয়ের মুগ্ধতা

মোতাহার হোসেন

স্বপ্নের পদ্মা সেতু ও পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে নির্মিত রেল লাইনে পরীক্ষামূলক রেল চলাচলের মধ্য দিয়ে দেশের ইতিহাসে তৈরি হলো অনন্য মাইলফলক। আর এর সঙ্গে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে সেতু ও রেল লাইনকে ঘিরে পদ্মার দুই তীরে গড়ে ওঠা বৃক্ষরাজির মনমুগ্ধকর ও নয়নাভিরাম 'সবুজ বলয়'।

প্রকৃতিপ্রেমী যে-কোনো পর্যটক, ভ্রমণকারী পদ্মা সেতু ও রেল দিয়ে চলাচল করার সময় নানা প্রজাতির গাছগাছালিতে শোভিত বৃক্ষরাজি দেখতে পাবে। এই দৃশ্য দেখে মনে হবে সবুজের অনন্য সমাহার, এসব বাহারি গাছগাছালি অনাবিল মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে অবিরত। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের দৃশ্য মানুষকে প্রকৃতি অপার সৌন্দর্যের অন্যজগতে নিয়ে যায়। শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবায় পদ্মা সেতুর টোল প্লাজা থেকে মাদারীপুরের শিবচরের পাচ্চর পর্যন্ত সাড়ে ১০ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক এবং পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্ত শুরুতে সেতুর উভয় প্রান্তে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর, মাঝে মাঝে ধান ক্ষেত, সড়কের দুই পাশে নানা জাতের ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো হয়েছে। আর সড়ক বিভাজকের উপর লাগানো হয়েছে নানা জাতের ফুলের গাছ। শুধু ফলদ, বনজ, ঔষধি গাছ নয়, এসব স্থানে রয়েছে নানা জাতের ফুল, নানা জাতের দেশি-বিদেশি ফলের গাছ।

এই সড়কের পাশাপাশি পদ্মা সেতুর চারটি পুনর্বাসন কেন্দ্র, দুটি সার্ভিস এরিয়া, কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড ও শেখ রাসেল সেনানিবাস এলাকায় বনায়ন করেছে শরীয়তপুর বন বিভাগ। পদ্মা সেতু প্রকল্প ও এক্সপ্রেস এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বনায়ন প্রকল্পের আওতায় আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, নারকেল, পেয়ারা, লিচু, সেগুন, জারুল, শিলকড়ই, রাজকড়ই, গামার, তেজপাতা, দারুচিনি, নিম, বহেড়া, অর্জুন, হরীতকী, বকুল, পলাশ, দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া, শিমুলসহ ৬১ ধরনের ফলদ, বনজ, ঔষধি গাছসহ বিভিন্ন ফুলের গাছ রয়েছে। সরকারের ৫টি সংস্থা পৃথক পৃথকভাবে পদ্মা সেতু ও রেল লাইনের পাশে, পদ্মা নদীর তীরে নির্মিত বাঁধের পাশে প্রায় বিভিন্ন প্রজাতির ১০ লক্ষাধিক গাছ রোপণের উদ্যোগ নিয়েছে। আসন্ন বর্ষা মৌসুমে এসব সংস্থাসমূহের এই উদ্যোগ শতভাগ বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূত্র। একই তথ্য রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজনও ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাঙালির সাহস, গর্ব, সক্ষমতা ও বিশ্বে মর্যাদা বৃদ্ধির অনন্য বিস্ময়ের প্রতীক পদ্মা সেতুকে ঘিরে 'সবুজ বলয়' সৃষ্টির এই উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পদ্মা সেতুর টোল প্লাজা পার হওয়ার পরই চোখে পড়বে এসব ফুল-ফলের গাছ। পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ শুরুর সময় লাগানো এসব গাছ এখন চারদিকে মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে। পদ্মা সেতু প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা বলছেন, দেশের অন্য কোনো প্রকল্পে এত বনায়ন হয়নি। বনায়ন প্রকল্পের আওতায় দুই লক্ষাধিক বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপণ করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই বনায়ন প্রকল্প।

সেতু বিভাগের প্রকৌশলীরা বলেন, ২০০৭-২০০৮ সালে যখন পদ্মা সেতুর জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়, তখন এ এলাকা ছিল ফসলের জমি আর লোকালয়। জমি অধিগ্রহণের পরে নিচু জায়গা বালু দিয়ে ভরাট করা হয়। তারপর সড়কসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এরপর ২০১২-২০১৩ সাল থেকে এসব স্থানে বনায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়।

শরীয়তপুর বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, ১০ বছর ধরে নিয়মিত পরিচর্যা আর রক্ষণাবেক্ষণ করে গাছগুলো পরিপক্ব করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বন বিভাগ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বনায়ন প্রকল্পটি।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের (সেতু বিভাগের) সহকারী প্রকৌশলী পার্থসারথি বিশ্বাস বলেন, পদ্মা সেতু প্রকল্পের অর্থায়নে বনায়ন করা হয়েছে। সেতু এলাকার সব অবকাঠামো ধরে বনায়ন করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির সবুজ গাছে ও বাহারি ফুলে এখন এলাকাটিতে অন্য রকম মুগ্ধতা সৃষ্টি করছে। এখানে আসা মানুষ ক্ষণিকের জন্য প্রকৃতির অপার স্নিগ্ধতার পরশ পাবে। পদ্মা সেতু প্রকল্প ঘিরে আশপাশের এলাকায় সবুজায়নও এগিয়েছে সমান তালে। নদীর দুই পাড় ও এক্সপ্রেস ওয়ের দুই পাশে রোপণ করা হয়েছে লাখ লাখ গাছের চারা। কয়েক বছরে এসব চারা বড়ো হয়ে সবুজের আবহ তৈরি করেছে পুরো এলাকায়।

পদ্মা পাড়ের জনপদ ছিল অনেকটা রুক্ষ। সেখানে এখন শোভা পাচ্ছে নানা প্রকারের বনজ, ফলদ, ঔষধি আর সৌন্দর্যবর্ধক বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের গাছ। শরীয়তপুরে পদ্মা সেতু প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংযোগ সড়কের পাচ্চর থেকে টোল প্লাজা পর্যন্ত রোপণ করা হয়েছে ৪৪ হাজার ৯৫০টি বনজ ও সৌন্দর্যবর্ধক ফুলের গাছ। এই জেলার দুটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে রোপণ করা হয়েছে দুই লক্ষাধিক ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ। এছাড়া সার্ভিস এরিয়া, কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড, শেখ রাসেল সেনানিবাসসহ প্রকল্প এলাকায় রোপণ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির আরও ৩ লাখ গাছের চারা। পদ্মা সেতুর দক্ষিণ প্রান্তের মহাসড়কের দুই পাশজুড়েও দৃষ্টিনন্দন ফুল-ফল গাছ প্রশান্তি এনে দেয়।

মাদারীপুর ও শরীয়তপুর বন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়কের শরীয়তপুরের জাজিরা থেকে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার পাচ্চর গোলচত্বর পর্যন্ত ছয় লেনের এক্সপ্রেস হাইওয়ের মাঝখানের অংশে নানা ধরনের গাছ রোপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পাতাবাহার, মসুন্ডা, সোনালু, বোতল ব্রাশ, এরিকা পাম্প, উইপিং দেবদারু, রঙ্গনসহ বিভিন্ন ধরনের বাহারি ফুলের ৬ হাজারসহ ৫৬ প্রজাতির প্রায় দেড় লাখ গাছ। বন বিভাগের কর্মীদের পরিচর্যা আর প্রকৃতির মহিমায় সড়কের ঢালে ফলদ ও বনজ গাছের চারাও বেড়ে উঠছে।

মাদারীপুরের কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল পরিবেশবিদ ড. বশীর আহম্মেদ বলেন, গাছ যেমন একদিকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে। অন্যদিকে মানুষের মনের খোরাকও মেটায়। পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়কে গেলে মনটা ভরে যায়। চোখ ধাঁধানো ফুলের সমারোহ।

পরিবেশবাদী সংগঠন 'ফ্রেন্ডস অব নেচার'-এর মন্তব্য, পদ্মা সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়কের আইল্যান্ডে যে গাছ লাগানো হয়েছে, তা সত্যি অসাধারণ। মহাসড়কের মাঝে আইল্যান্ডে ফুলের গাছ, দুই পাশে ফলের গাছ। এমন সৌন্দর্যময় প্রকৃতি দেশে আর কোথাও আমার চোখে পড়েনি। মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক ড. রহিমা খাতুন বলেন, পদ্মা সেতু কর্তৃপক্ষ পদ্মা সেতুর দক্ষিণ শিবচর প্রান্তে বন বিভাগের মাধ্যমে গত দুই বছরে সবুজায়নের প্রকল্প হাতে নেয়। এরই অংশ হিসেবে ফুল, ফল ও ঔষধি গাছের চারা লাগানো হয়েছে। ইতোমধ্যে এটি পর্যটন এলাকায় পরিণত হয়েছে। ভ্রমণপিয়াসু দর্শনার্থীর ভিড় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সড়ক ও জনপদ বিভাগের মাদারীপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, সড়কের মাঝে ছোটো গাছ লাগালে তেমন ক্ষতি হয় না। ফুল ও ছোটো ফল গাছের শাখা-প্রশাখা তেমন বাড়ে না। পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়কের মাঝে প্রায় ১২ ফুট চওড়া জায়গা আছে, সেখানে কোন ধরনের গাছ লাগানো উচিত তা গবেষণা করেই বন বিভাগ লাগিয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, পদ্মা সেতু ও রেল সংযোগকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য তথা প্রকৃতির আধার সবুজ বলয় রক্ষা ও সম্প্রসারণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। তাহলে প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার এই মহতী উদ্যোগ স্থায়ী রূপ পাবে।

মোতাহার হোসেন: উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক ভোরের আকাশ এবং সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

বিদেশ থেকে ফোনেই মিলছে চার ধরনের ভূমিসেবা

প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখন চার ধরনের ভূমিসেবা বিদেশ থেকেই গ্রহণ করছেন। এসব ভূমিসেবার মধ্যে রয়েছে– 'নাগরিক ভূমিসেবা ২৪/৭' (কাস্টমার কেয়ার), খতিয়ান/নামজারি খতিয়ানের সত্যায়িত কপি, মৌজা ম্যাপের সত্যায়িত কপি এবং ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান। বিদেশ থেকে ভূমিসেবা হটলাইন ১৬১২২-এর লং-কোড +৮৮০ ৯৬১২-৩১৬১২২ এ ফোন করে ২৪ ঘণ্টার যে-কোনো সময় কিংবা ফেসবুকে (www.facebook.com/land.gov.bd) মেসেজ কিংবা কমেন্ট করে প্রবাসীরা এখন ভূমি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর জানতে পারছেন এবং বিবিধ অভিযোগ দিতে পারছেন।

এ ছাড়া, উপরের একই নম্বরে ফোন করে কিংবা স্মার্ট ভূমিসেবা পোর্টালে (www.land.gov.bd) গিয়ে খতিয়ান/নামজারি খতিয়ানের সত্যায়িত কপি ও মৌজা ম্যাপের সত্যায়িত কপির জন্য প্রবাসীরা আবেদন করলে বাংলাদেশের ডাক বিভাগ বিদেশে প্রবাসীদের সংশ্লিষ্ট ঠিকানায় এ সব পৌঁছে দিচ্ছে। একইভাবে ফোন করে কিংবা পোর্টালে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে বিদেশ থেকে ভূমি উন্নয়ন করও দিচ্ছেন প্রবাসীরা। পর্যায়ক্রমে প্রবাসীদের আরও কিছু ভূমিসেবার আওতায় নিয়ে আসা হবে, এর মধ্যে অন্যতম নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং অনলাইনে বিবিধ মামলার শুনানিতে অংশগ্রহণ করার সুবিধা।

প্রতিবেদন: সীমান্ত হোসেন

কবি সুফিয়া কামালের ১১২তম জন্মবার্ষিকী

শিরিনা আক্তার

কবি বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি সারাজীবন নারীমুক্তি, মানবমুক্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিরলস কাজ করে গেছেন। ২০শে জুন ২০২৩ সেই মহীয়সী কবি বেগম সুফিয়া কামাল-এর ১১২তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদে মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। শায়েস্তাবাদে নানা বাড়িতে রক্ষণশীল অভিজাত পরিবেশে বড়ো হয়েও সুফিয়া কামালের মনোগঠনে দেশ, দেশের মানুষ ও সমাজ এবং ভাষা ও সংস্কৃতি মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সুফিয়া কামাল তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। তখনকার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে বাস করেও তিনি নিজ চেষ্টায় হয়ে ওঠেন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত।

১৯১৮ সালে তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর শিশু মনে রোকেয়া দর্শনের সেই স্মৃতি অম্লান হয়ে থাকে, বেগম রোকেয়ার ব্যক্তিত্ব তাঁকে অবিরাম অনুপ্রাণিত করতে থাকে। ১৯২৫ সালে বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কিছু দিন চরকায় সুতা কাটেন, তিনি এ সময় নারী কল্যাণমূলক সংগঠন 'মাতৃমঙ্গল'-এ যোগ দেন। সুফিয়া কামালের পেশা জীবন শুরু হয় ১৯৩২ সালে তাঁর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুর পর। তিনি কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এ পেশায় নিয়োজিত থাকেন। এর মাঝে ১৯৩৯ সালে কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি কিছুকাল নারীদের জন্য প্রকাশিত সাময়িকী *বেগম*-এর সম্পাদক ছিলেন। সুফিয়া কামাল সাহিত্যপাঠের পাশাপাশি সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' সে সময়ের প্রভাবশালী সাময়িকী *সওগাত*-এ প্রকাশিত হয়। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে। ১৯৩৭ সালে তাঁর গল্পের সংকলন *কেয়ার কাঁটা* প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* প্রকাশিত হয়, মুখবন্ধ লেখেন কাজী নজরুল ইসলাম। বইটি বিদগ্ধজনের প্রশংসা কুড়ায় যাঁদের মাঝে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯৪৯ সালে সুফিয়া কামাল ব্যাপকভাবে সমাজ সেবা ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। এ বছরই তাঁকে সভানেত্রী করে পূর্ব পাকিস্তান 'মহিলা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সুলতানা* পত্রিকা, যার নামকরা হয় বেগম রোকেয়ার *সুলতানার স্বপ্ন* গ্রন্থের প্রধান চরিত্রের নামানুসারে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সুফিয়া কামাল সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর দমন নীতির অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকীতে তিনি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৬৯ সালে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) গঠিত হলে তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাচিত হন এবং আজীবন তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

কবি সুফিয়া কামালের কবিতার বিষয়– প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত অনুভূতি, বেদনাময় স্মৃতি, জাতীয় উৎসবাদি, স্বদেশানুরাগ, মুক্তিযুদ্ধ এবং ধর্মানুভূতি। তাঁর কবিতা– চীনা, ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান, পোলিশ, রুশ, ভিয়েতনামিক, হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে রুশ ভাষায় তাঁর *সাঁঝের মায়া* গ্রন্থটি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হয়। অন্তরঙ্গ আবেগের বিশিষ্ট পরিচর্চায় এবং ভাষা ভঙ্গির সহজ আবেদনঘন স্পর্শে তাঁর কবিতা সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

তাঁর রচনাসমূহ

কাব্যগ্রন্থ: *সাঁঝের মায়া* (১৯৩৮), *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), *প্রশান্তি ও প্রার্থনা* (১৯৫৮), *উদাত্ত পৃথিবী* (১৯৬৪), *দিওয়ান* (১৯৬৬), *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯), *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৯৭০) ও *মোর জাদুদের সমাধি পরে* (১৯৭২)।

গল্প সংকলন: *কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭)।

ভ্রমণ কাহিনি: সোভিয়েতে দিনগুলি (১৯৬৮)।

স্মৃতিকথা কাহিনি: একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯)।

আত্মজীবনীমূলক রচনা: একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)।

শিশুতোষ: *ইতল বিতল* (১৯৬৫), *নওল কিশোরের দরবারে* (১৯৮১)।

অনুবাদ: *সাঁঝের মায়া*- বলশেভনী সুমের্কী (রুশ) (১৯৮৪)।

পুরস্কার: কবি সুফিয়া কামাল ৫০টির বেশি পুরস্কার লাভ করেছেন, এর মধ্যে কয়েকটি: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), সোভিয়েন লেলিন পদক (১৯৭০), একুশে পদক (১৯৭৬), নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৭৭), সংগ্রামী নারী পুরস্কার, চেকোশ্লোভাকিয়া (১৯৮১), মুক্তিধারা পুরস্কার (১৯৮২), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৫), দেশবন্ধু সি আর দাস গোল্ড মেডেল (১৯৯৬) ও স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭) উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৯ সালে ২০শে নভেম্বর সুফিয়া কামাল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। প্রতিবছর আনুষ্ঠানিকভাবে ২০শে জুন নানা কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

শিরিনা আক্তার: প্রাবন্ধিক

বাবা হচ্ছেন ভরসা ও ছায়ার নাম

জুয়েল মোমিন

বাবা হচ্ছেন ভরসা ও ছায়ার নাম। তিনি হচ্ছেন পরম নির্ভরতার প্রতীক। বাবার প্রতি সন্তানের সম্মান, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশের জন্য প্রতিবছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বিশ্বে পালিত হয় 'বাবা দিবস'। সে হিসাবে এ বছর বাবা দিবস ২১শে জুন। পৃথিবীর সব বাবার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশের ইচ্ছা থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে বাবা দিবস পালন করা শুরু হয়। বাবা দিবস ঘোষণার বিষয়টি প্রথম ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সনোরা স্মার্ট ডোড নামের এক তরুণীর মাথায় আসে। ১৯১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাবা দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণার বিল উত্থাপন করা হয়। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এ দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেন।

সন্তানের জন্য বাবার ভালোবাসা অসীম। সন্তানের জন্য একজন বাবা তার জীবনও বাজি রাখতে পারেন। এমনই স্বার্থহীন যার ভালোবাসা, সেই বাবাকে সন্তানের খুশির জন্য জীবনের অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয়। সন্তানদের সেটি স্মরণে রেখে সবসময়ই উচিত বাবার প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ সময়ের গতি কখনো থেমে থাকে না। কালের এমনই লীলা যে সন্তানও একদিন বাবা হয়ে ওঠে। তখন সে নিজে বাবা হওয়ার কী আনন্দ সেই অনুভূতির স্বাদ পায়। ধীরে ধীরে সে বাবা নামক সম্পর্কটির সাথে পরিচিত হতে থাকে এবং সন্তানের প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো আবদারের সাথে সে তার নিজের ছোটোবেলার সঙ্গে যোগ করার চেষ্টা করে। তখন চোখের কোণা থেকে এক ফোঁটা জল গাল গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। তখন বাবার সঙ্গে কাটানো সেই ছেলেবেলার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। যাদের বাবা আছেন তাদের উচিত তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করা। কারণ বাইরে শত ঝড়ঝঞ্ঝা হওয়া সত্ত্বেও বাবা কখনো এর আঘাত তার সন্তানের গায়ে লাগতে দেন না। আমাদের উচিত বৃদ্ধ বয়সে তাদের বন্ধু হওয়া। তারা যেভাবে শক্ত হাতে ছোটোবেলায় আমাদের কোমল হাতটি ধরে চলতে শিখিয়েছেন, পড়তে শিখিয়েছেন, মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচতে শিখিয়েছেন, আমাদের উচিত তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া। কারণ আমরা বর্তমানে যা কিছু হয়েছি তা তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বদৌলতে।

পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করতে সবসময় বাবা সচেষ্ট থাকেন। পরিবার তথা সমাজে একজন পিতার যে গুরুত্ব তা বোঝাতেই মূলত বাবা দিবস বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে থাকে। কারণ পিতা-মাতার আসল স্থান তাদের পরিবারে, সন্তানের মাঝে। আর সংসারে বাবা হচ্ছেন বটবৃক্ষের মতন। সূর্যের তাপে নিজে পুড়ে সন্তানকে শীতল ছায়ায় বড়ো করে তোলেন। বাবার তুলনা বাবা নিজেই। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠার ফলে সন্তানের সাথে পিতা-মাতার সম্পর্ক তেমন শক্ত ভীতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। যার ফলে একক পরিবার সৃষ্টি হচ্ছে। সন্তানেরা একা পিতা-মাতাকে ফেলে নতুন সংসার গঠনে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে তাদের স্থান হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে। কিন্তু এটা বর্তমান সমাজের বড়ো একটা অবক্ষয়।

যে বাবা তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দিনরাত পরিশ্রম করে নিজের সর্বস্ব দিয়ে সন্তানদের একটু একটু করে বড়ো করে তোলেন, সন্তানদের সুখ-শান্তির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেন, সেই বাবাকে কোনো সন্তান বোঝা মনে করতে পারে? আমাদের সমাজে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে একক পরিবার ব্যবস্থা চালু হওয়ার সাথে সাথে কোনো কোনো সন্তান সেই পরম মমতা দিয়ে ঘিরে রাখা বাবাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোঝা মনে করে। কখনো কখনো নিজের হাতে গড়া সংসার ছেড়ে বৃদ্ধাশ্রমই হয়ে ওঠে তাদের আপন ঠিকানা। কিন্তু সন্তান চাইলেই কি বৃদ্ধাশ্রমে

পাঠিয়ে দিতে পারে পিতা-মাতাকে? সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি কোনো অধিকার নেই?

আর এর থেকে উত্তরণের জন্য পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক যাতে আরও দৃঢ় হয় সেজন্য বর্তমান সরকার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের জন্য ২০১৩ সালে আইন পাস করেছে।

আইনে যা বলে

'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩' নামের একটি আইন পাস করেছে বর্তমান সরকার। এই আইন অনুযায়ী বৃদ্ধ ও কর্মহীন পিতা-মাতা তার সন্তানের কাছ থেকে অধিকার আদায় করতে পারেন। এই আইনে প্রত্যেক কর্মক্ষম সন্তানকে তার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের নিশ্চয়তা দিতে হবে বলে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই আইনের ৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে

- প্রত্যেক সন্তানকে তার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিতে হইবে,
- কোনো পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকিলে সেইক্ষেত্রে সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদের পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিবে,
- এই ধারার অধীনে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে পিতা-মাতার একইসঙ্গে একই স্থানে বসবাস নিশ্চিত করিতে হইবে,
- কোনো সন্তান তাহার পিতা বা মাতাকে বা উভয়কে তাহার, বা ক্ষেত্রমতে, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোনো বৃদ্ধ নিবাস কিংবা অন্য কোথাও একত্রে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করিতে বাধ্য করিবে না,
- প্রত্যেক সন্তান তাহার পিতা এবং মাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখিবে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করিবে,
- পিতা বা মাতা কিংবা উভয়, সন্তান হইতে পৃথকভাবে বসবাস করিলে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে নিয়মিতভাবে তাহার, বা ক্ষেত্রমতে, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে,
- কোনো পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে, সন্তানদের সহিত বসবাস না করিয়া পৃথকভাবে বসবাস করিলে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পিতা বা মাতার প্রত্যেক সন্তান তাহার দৈনন্দিন আয়-রোজগার, বা ক্ষেত্রমতে, মাসিক আয়, বাৎসরিক আয় হইতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা বা মাতা, বা ক্ষেত্রমতে, উভয়কে নিয়মিত প্রদান করিবে,

পিতা-মাতাকে ভরণ-পোষণ প্রদান না করিলে জেল-জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। যথা: কোনো সন্তান কর্তৃক ধারা ৩-এর যে-কোনো উপ-ধারার বিধান কিংবা ধারা ৪-এর বিধান লংঘন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, বা উক্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩(তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বাবা– শুধু একটি সম্পর্কের নাম নয়, তিনি একজন অভিভাবক। তার ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠে পুরো সংসার। তিনি যেন এক বিরাট ছায়াদানকারী বটবৃক্ষ। তাই বাবা দিবসে প্রত্যেক বাবার প্রতি রইল সশ্রদ্ধ সালাম ও ভালোবাসা।

জুয়েল মোমিন: প্রাবন্ধিক

শেখ হাসিনার 'কমিউনিটি ক্লিনিক'-এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে একটি রেজ্যুলেশন ১৭ই মে গৃহীত হয়। 'কমিউনিটিভিত্তিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা: সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্জনের লক্ষ্যে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি' শিরোনামের এই রেজ্যুলেশনটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বাংলাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক মডেল প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল উদ্ভাবনী উদ্যোগকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়ে 'দ্য শেখ হাসিনা ইনিশিয়েটিভ' হিসেবে উল্লেখ করে। এটি জনগণের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সেবায় সাম্য প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। সাধারণ পরিষদে রেজ্যুলেশনটি উপস্থাপন করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আবদুল মুহিত। ৭০টি সদস্য রাষ্ট্র এই রেজ্যুলেশনটি কো-স্পন্সর করে।

রাষ্ট্রদূত মুহিত তাঁর বক্তব্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা অর্জনে এই রেজ্যুলেশনের ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরেন। এই রেজ্যুলেশনের অনুমোদনকে ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনের বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন।

দেশের সকল মানুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে এই অনন্য কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করেছিলেন– যা সারা দেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের দোরগোড়ায় সরকারের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুফল সরবরাহে বিপ্লব ঘটিয়েছে। মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার এ পর্যন্ত দেশে পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বে ১৪ হাজারেরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এই স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবে।

প্রতিবেদন: শাওন আহমেদ

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস এবং বাংলাদেশ

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ

প্রতিবছর ১২ই জুন শিশুশ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করে। শিশু অধিকার সুরক্ষা ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০০২ সাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবছর দিবসটি পালন করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। ২০০২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১২ই জুনকে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা করার পর থেকে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য শিশুশ্রম বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণ করা। এ বছরও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'শিশুর শিক্ষা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করি, শিশুশ্রম বন্ধ করি'– এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। সরকারি দপ্তর, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইউনিসেফসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে বলেন, 'শিশুশ্রম একটি বৈশ্বিক সমস্যা। সরকারের লক্ষ্য এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে সকল ধরনের শিশুশ্রম হতে মুক্ত করা।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে শিশুশ্রম নিরসনে কিছু সরকারি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলেন, "সরকার শিশুশ্রম-নিরসনের লক্ষ্যে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০' প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও শিশুদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 'জাতীয় শিশু নীতি-২০১১', 'শিশু আইন-২০১৩', 'বাল্যবিবাহ বিরোধ আইন-২০১৭' এবং গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষায় 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে সকল ধরনের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ' কাজ করছে। সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের সরকার জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিষয়ক আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০০৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ছিল ৩২ লক্ষ। আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১৩ সালে শিশুশ্রম সমীক্ষায় শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৭ লক্ষে দাঁড়িয়েছে।"

রাষ্ট্র, সমাজ ও আমাদের সবার দায়িত্ব শিশুদের অধিকার রক্ষা করা। দেশের কয়েক লাখ শিশু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শ্রমজীবী শিশুদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা থেকে সাধারণ শ্রমে নিযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসন বিষয়ক আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে। সরকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের প্রত্যাহার করে তাদেরকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করছে। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি হতদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনেও ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণে 'সবার জন্য শিক্ষা'র আওতায় সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণসহ উপবৃত্তি প্রদান এবং দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু রয়েছে।

শিশুশ্রম বন্ধে বাংলাদেশে কাজ করছে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বেসরকারি সংস্থা। সরকার শিশুশ্রম নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, কারা শিশু। এখানে বলা আছে, ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে কাজে নেওয়া যাবে না। ১৪ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত কাজে নেওয়া যাবে, তবে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেওয়া যাবে না। শিশুশ্রম নীতি, ২০১০ বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও উন্নয়ন সহযোগীদের নিয়ে কাজ করছে। শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কতগুলো পদক্ষেপ ঠিক করেছে সরকার। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– নীতির প্রয়োগ, শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, সামাজিক সচেতনতা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করে শিশুশ্রম দূর করার জন্য চারটি কমিটি করা হয়েছে। যেমন ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার ওয়েলফেয়ার কমিটি; এর প্রধান হলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী। বিভাগীয় চাইল্ড লেবার ওয়েলফেয়ার কমিটি রয়েছে; এর প্রধান হলেন বিভাগীয় কমিশনার। জেলা শিশু অধিকার ফোরাম; এর প্রধান জেলা প্রশাসক। উপজেলা চাইল্ড লেবার মনিটরিং কমিটি; এর প্রধান উপজেলা নির্বাহী অফিসার। আইএলও বাংলাদেশ সরকারকে বিভিন্নভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। সরকারের সঙ্গে আইএলও, এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে। সবার উদ্দেশ্য শিশুশ্রম নিরসন করা।

এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে সকল ধরনের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ' কাজ করছে। সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর বিকাশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০০৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩২ লাখ। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২৩ সালে শিশুশ্রম সমীক্ষা অনুযায়ী শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৭ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন গণমাধ্যম দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে অনুষ্ঠান, টিভিসি প্রচার করা হয়। সারাদেশে কলকারখানা ও শ্রমঘন এলাকায় ব্যানার ফেস্টুন পোস্টার টাঙানো হয়। শিশুশ্রম নিরসনে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন শিল্প এলাকার কলকারখানায় শিশুশ্রম নিরুৎসাহিত করতে বিশেষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিশুশ্রম নিরসনের জন্য দরকার গণমাধ্যমে এ বিষয়ে বেশি বেশি প্রচার করা। বিভিন্ন ধরনের নাটক ও গানের মাধ্যমে প্রচার চালানো যেতে পারে। দরিদ্র শিশুদের অভিভাবকদের কাজের ব্যবস্থা করা, বেশি করে তদারকির ব্যবস্থা করা, শিশুশ্রম নিরসনে যেসব আইন আছে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। বাংলাদেশে শিশুশ্রম ধীরে ধীরে কমছে বলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাদের প্রতিবেদনে তথ্য পাওয়া যায়।

এসডিজিতে ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা আছে। এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে জোরদার করতে হবে। কাজ করার জন্য নীতিমালা ও বিভাগীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত কমিটিকে সক্রিয় ও জোরদার করতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনের মতো এত বড়ো কাজ হয়ত শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ব্যবসায়িক খাতসহ সমাজের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

৩১শে মে ২০২৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, দেশের প্রতিটি শিশু যাতে সুরক্ষিত পরিবেশে বেড়ে উঠে সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত শিশু কল্যাণ বোর্ড শিশুদের উন্নয়নে কাজ করবে। তিনি বলেন, সরকার শিশুদের আগামীর সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিশু আইন প্রণয়ন করেছে। আইনের বিধানানুযায়ী জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো এই বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হলো। শিশুদের কল্যাণে জাতীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যন্ত গঠিত বোর্ডকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। উল্লেখ্য, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ডের সভাপতি। বোর্ডের প্রথম সভায় সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ান সংবাদমাধ্যমকে জানান, সরকার শিশুশ্রম বন্ধে কাজ করছে। শিশুশ্রম নিরুৎসাহিত করতে সরকার স্কুলগামী শিশুদের নগদ অর্থ, খাবারসহ নানা ধরনের সুবিধা দিচ্ছে। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম বন্ধে শতভাগ সফলতা আসবে বলেও জানান তিনি।

২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের আইন, নীতিমালা, বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে কাজ করা আবশ্যক। শিশুশ্রম নির্মূলে সামাজিক সুরক্ষার আওতা বাড়ানো দরকার। সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসন হবে। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসে আমাদের প্রত্যাশা– আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুরক্ষিত থাকুক এবং বাংলাদেশ সরকার শিশুশ্রম নিরসনে যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা বাস্তবায়িত হোক।

ভাস্করেন্দু অর্ণবানন্দ : সাংবাদিক, সংগঠক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

মুক্তির সনদ

সুজন বড়ুয়া

লোকটা ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে নেতার সামনে এসে দাঁড়ায়। নেতা চেয়ারে বসা। সকালবেলা খবরের কাগজ পড়া তাঁর অভ্যাস। তিনি খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে আছেন। নেতার দৃষ্টি আকর্ষণের আশায় বেশ একটু শব্দ করেই একটি সালাম ঠুকে লোকটা।

নেতা মুখ তুলে তাকান। সামনে দাঁড়ানো জীর্ণ-শীর্ণ লোকটাকে ঠিক চিনতে পারছেন না তিনি। ভাবছেন আগে কোথাও কি দেখেছেন লোকটাকে?

এরই মধ্যে কথা বলে ওঠে লোকটা, এতদিন পর আমাকে আপনার চিনতে পারার কথা নয় ভাই সাহেব। আমি কফিলউদ্দিন। গতকালই খবর পেয়েছি, আপনি আবার এসেছেন এবং এখানে আছেন।

নেতার মুখটাও এবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবছা আবছা মনে পড়ছে, এর আগের বারে এখানেই দেখেছিলেন লোকটাকে। স্মিত হেসে নেতা বলেন, কফিলউদ্দিন মানে ঐ মাস্টার!

–জি, ভাই সাহেব। কফিলউদ্দিন অম্লান হাসে।

–তুমি এখনও আছো? ছাড়া পাও নাই?

–না, ছাড়া পাই নাই। ছাড়া পেলেও যাব কই? বাড়ির লোকেরা তো আমারে নিতে চায় না।

নেতা চুপচাপ তাকিয়ে থাকেন কফিলউদ্দিনের দিকে।

নেতা আবার ফিরে এসেছেন পুরানো জায়গায়। এটি যেন তাঁর দ্বিতীয় আবাসস্থল। মাঝে মাঝেই এখানে আসতে হয় তাঁকে। তবে তাঁর থাকার ঘর আর থাকার মেয়াদ অনির্ধারিত। এবার তাঁকে রাখা হয়েছে পাগলাগারদের কাছে একটি ঘরে। এ ঘরটা ছাড়া এদিকটায় সবই সেল। মোট ৪০টি সেল আছে এখানে। প্রতিটি সেলে রাখা হয় একজন করে কয়েদি। এদের মধ্যে অনেক একরারী ও সাংঘাতিক প্রকৃতির কয়েদি আছে, যারা এক বা একাধিক বার জেল থেকে পালিয়েছে বা পালাবার চেষ্টা করেছে। এদের কেউ কেউ চুপচাপ থাকে, কেউবা আবার সারারাত গান গায়। ভাটিয়ালি, পল্লিগীতি, গজল, মারফতি– কত রকমের গান তার ঠিক নেই। কেউ কেউ রাতভর একা একা গালাগালি চেঁচামেচি করে। কেউ থালা পিটায়, দরজা ধাক্কায়– এই অবস্থা পুরো অঞ্চলের।

কফিলউদ্দিনও ওখানকার বাসিন্দা। তবে কফিলউদ্দিন পুরোপুরি

পাগল নয়, তাকে ক্ষ্যাপাটে বলা যায়। প্রায় এগারো মাসই ভালো থাকে সে। মাঝে মাঝে বড্ড ক্ষেপে যায়। এই ক্ষ্যাপাটে স্বভাবের জন্যই তারও পাগলের তকমা জুটেছে। আর তার ঠিকানা হয়েছে জেলের পাগলাগারদে। কুমিল্লায় বাড়ি। লেখাপড়া অল্পবিস্তর জানে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র পড়াতো। তাই তার মাস্টার নাম রটে যায়। সবাই বলে কফিলউদ্দিন মাস্টার। দোষ শুধু একটাই, ক্ষ্যাপাটে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। সংসার-ধর্ম করেনি। বাবা-মা নেই। তিন ভাই আছে। ভাইয়েরা খোঁজখবর রাখে না। বাইরে থাকলে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে কেবল হাঙ্গামা বাঁধায়। তার ভয়ে তটস্থ থাকে সবাই। এলাকার লোকেরাই তাই কায়দা করে জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। সে অনেক আগের কথা। জেলে বছরের পর বছর একইভাবে দিন কাটছে তার। কারণ ভালো না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের কয়েদির বিচার হয় না।

নেতাকে চুপ থাকতে দেখে কফিলউদ্দিনই কথা বলে ওঠে, আবার কেন আপনার আসতে হইল ভাই সাহেব?

–আরে এর নাম হলো দেশরক্ষা। আমাকে শ্রীঘরে আটকে রাখতে না পারলে সরকারের লোকদের শান্তিতে ঘুম হয় না।

–অশান্তির কী কাজ করলেন আবার?

–কী করিনি বলো? আমি ছয় দফার ডাক দিয়েছি, ছয় দফা।

–ছয় দফা আবার কী ভাই সাহেব?

–সে কি তুমি বুঝবেরে কফিল?

–আমি সবই বুঝি ভাই সাহেব। আমি পাগল না, আমারে পাগল বানায়ে রাখছে। পাগল বানাইয়া আমারে তারা খাটায় নিতেছে। আমারে দিয়া তারা এখন হিসাবের কাজ করায়। আমারে রাইটার দফায় কাজ দিছে। হিসাব লিখি, দরখাস্ত লিখে দিই, চিঠি বিলি করি– এসব কাজ এখন আমার করতে হয়।

নেতা চুপচাপ শুনছিলেন। তবে কফিলউদ্দিনের দিকে নেতার মন নেই। তাঁর মাথায় এখন অনেক চিন্তা। তিনি দলের সভাপতি। তাঁর এবং তাঁর দলের ওপর নির্ভর করছে এ দেশের মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনায় কোনো ভুল করা চলবে না। এ কথা তিনি ভালো করে জানেন। এ দেশের মানুষ যে কতটা অরক্ষিত তা গত পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ই প্রমাণ হয়ে গেছে। এ দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর কোনো মাথাব্যথা নেই। তারা কাশ্মীর রাজ্যের অধিকার ও ক্ষমতার দম্ভ দেখানো নিয়ে ব্যস্ত। এ দেশের জনগণের কী হলো সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। এত অবজ্ঞা-অবহেলা মেনে নেওয়া যায় না। তাই নেতাকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা ভাবতে হচ্ছে। গত ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনে এ লক্ষ্যে ছয় দফা ঘোষণা করেছেন। ছয় দফার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য তিনি সারা পূর্ব বাংলায় গণসংযোগ সফর শুরু করেছিলেন। এ সময় তাঁকে সিলেট, যশোর, ময়মনসিংহ, ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে আটবার গ্রেপ্তার করা হয়। সর্বশেষ ৮ই মে নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। তারপর থেকে তিনি আছেন এই কেন্দ্রীয় কারাগারে। এখানে তাঁকে দেওয়া হয়েছে ডিভিশন কয়েদির মর্যাদা। এই নির্জন কারাকক্ষে মানুষের সঙ্গ তাঁর খুব ভালো লাগে। আলাপ-গল্পে সময় কেটে যায়।

কিন্তু এদিকে বেশ বেলা হয়ে এসেছে। নেতা আর কফিলউদ্দিনের কথার মাঝখানে আরেক লোক এসে হাজির। এ লোকটাকে নেতা চেনেন। আগেও এসেছে। নাম রহমতউল্লাহ। প্রথমে ফাঁসির আদেশ হয়েছিল তার। পরে বিশ বছর কারাদণ্ড হয়েছে। ঝাড়ুদফায় কাজ করে। সময় পেলেই মাঝে মাঝে আসে। কারা যেন তাকে উসকায়, যা, নেতাকে ধর, নেতা বলে দিলেই ছাড়া পাবি। ব্যস, নেতার কাছে এসেই সে পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয়। কিন্তু আজ কফিলউদ্দিনকে দেখে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইল। কফিলউদ্দিনও রহমতকে দেখতে পেয়ে যেন যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। বলল, আচ্ছা, ভাই সাহেব, আজকে আসি। আরেক দিন আসব। আস্‌সালামুওয়ালাইকুম।

কফিলউদ্দিনকে বিদায় দিয়ে নেতা রহমতের দিকে তাকান, কী, কেমন আছো তুমি?

–কেমন আর থাকুম হুজুর! হাসপাতালে গেছিলাম।

–তা হলে তো ভালোই আছো। শরীর খারাপ হলে বিনামূল্যে ওষুধ-পথ্য পাও। এ কি কম কথা!

– আমার এসব ওষুধ-পথ্য আরাম চাই না হুজুর। আমারে আপনি ছাড়ায়ে দেন। আপনি বললেই জেলখানা থেকে বের করে দিবে। আপনি আমার এই উপকারটুকু করেন।

রহমতের কথা শুনে নেতা হাসেন, আমি তো তোমার মতোই একজন কয়েদি। আমার ক্ষমতা থাকলে আমিই-বা জেলে আসব কেন?

রহমত নাছোড়বান্দা। বলে, আপনি কলম মাইরা দিলেই কাজ হইয়া যায়।

নেতা এবার হাসতে হাসতে বলেন, কলম আছে, কিন্তু মাইরা দিবার ক্ষমতা নাইরে রহমত।

কার কথা কে শোনে। রহমতের এক কথা, তাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে দিতেই হবে।

নেতার আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে হলো না। তার মাথায় কেবল ঘুরছে ৭ই জুনের হরতাল-ধর্মঘটের কথা। ছয় দফার আন্দোলনের পক্ষে এবং দলের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এ কর্মসূচি। কিন্তু সরকার কর্মসূচি বানচাল করার জন্য বদ্ধপরিকর। চালাচ্ছে বেপরোয়া অভিযান। হরতাল-ধর্মঘটের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। মাইক্রোফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। গ্রেপ্তার করছে সক্রিয় নেতাকর্মীদের। গতকাল রাতেও গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিয়ে এসেছে অনেককে। কোথায় তাদের রাখছে? মনে হয় শাস্তিস্বরূপ ১০ নম্বর সেলেই রাখবে। এমন খারাপ সেল পুরো জেলখানায় আর নেই। এ সেলে বাতাস ভুলেও প্রবেশ করে না। এত অত্যাচার-অনাচার, এত শোষণ-পীড়ন! তবু সাধারণ কর্মীরা রাজপথে সরব, জেগে আছে বাইরে। নিশ্চয় এবার কিছু হবে!

নেতা যতই এসব ভাবেন, ততই অভিভূত হন। কিন্তু অক্ষম আক্রোশে মনটা কেমন একটু বিষিয়ে ওঠে তাঁর। কিছুই ভালো লাগে না। খাওয়া-দাওয়া করতেও ইচ্ছে হয় না। রহমতকে বিদায় দিয়ে নিরিবিলিতে বিছানায় শুয়ে থাকেন নেতা।

এভাবে কেটে যায় কয়েকটা দিন। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কেটে যায় ৭ই জুনও। হরতাল শেষ পর্যন্ত কতটুকু পালিত হয়েছে কে জানে? ৮ তারিখ ভোরবেলা থেকে নেতা অপেক্ষা করে আছেন খবরের কাগজের জন্য। কখন খবরের কাগজ আসবে? দেশ ও জাতির খবর পাবেন। অবশ্য হরতালের খবর ছাপার ওপরও নিষেধাজ্ঞা আছে।

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর নেতার কাছে এল আজকের পত্রিকা।

নেতা অবাক। পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলোর জায়গায় জায়গায় গাঢ় কালো কালি লেপ্টানো। হরতাল-ধর্মঘটের খবর ও ছবি যাতে স্পষ্ট দেখা না যায়, সেজন্য এই অপচেষ্টা। কিন্তু এতে যে সরকারের দুর্বলতা ও জনবিচ্ছিন্নতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেই হুঁশ-জ্ঞান সরকারের নেই! হায় গণতান্ত্রিক সরকার!

তবু খবরের কাগজের এই অবস্থা দেখে নেতার বুঝতে অসুবিধা হলো না হরতাল কতটা সফল হয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে জেনে গেলেন ছয় দফার সমর্থনে সারা দেশে শিল্পকারখানায় ধর্মঘট ও হরতাল পালিত হয়েছে। ধর্মঘটের সময় তেজগাঁও, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী শিল্প এলাকায় পুলিশের গুলিতে মনুমিয়াসহ কয়েকজন শ্রমিক নিহত হয়েছে। নেতা বুঝে গেলেন ছয় দফাকে সরকার কতটা ভয়াবহ মনে করছে। নেতা ভেতরে ভেতরে আন্দোলিত, উদ্বেলিত–ছয় দফা তাহলে দেশ ও জাতির মহাসনদে (ম্যাগনাকার্টা) পরিণত হতে যাচ্ছে।

নির্জন কারাকুঠুরিতে একাকী নেতার দিন কাটে। শুয়ে বসে বই-পত্রিকা পড়ে কত আর থাকা যায়! এরই মাঝে আবার একদিন কফিলউদ্দিন মাস্টার এসে হাজির। নেতাকে সালাম দিয়ে সামনে সিঁড়ির মেঝেতেই বসে পড়ে। একগাল হেসে বলে, ভাই সাহেব, আপনি কী ছয় দফা দিলেন, সরকারের তো কাঁপুনি ছুটি গেছে। সবাই বলাবলি করতাছে, ছয় দফাতেই সরকারের ঘণ্টা বাজবো। ছয় দফাগুলো কেমন একটু বলেন না ভাই সাহেব।

নেতার মন-মেজাজ আজ কিছুটা শান্ত। তার ওপর কফিলউদ্দিনের উচ্ছ্বাস নেতাকে কেমন যেন নাড়া দিল ভেতর থেকে। তিনি হালকা চালে বলেন, কী, কফিল, আজকে এমন করে ক্ষ্যাপলে কেন? তুমি ঠিক আছো তো?

–হ্যাঁ, আমি পুরা ঠিক আছি। আপনি বলেন, আমি শুনব।

নেতা বলতে শুরু করেন, তাহলে শোনো। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ছাড়া বাঙালির মুক্তি আসবে না। তাই ছয় দফা বেছে নিলাম। ছয় দফাগুলো হলো–

এক. দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হতে হবে এমন, যেখানে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। জনসাধারণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে আইন পরিষদ। আইন পরিষদ হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

দুই. কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ফেডারেল সরকারের অধীনে থাকবে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগ। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

তিন. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। অথবা দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা চালু থাকলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থপাচার করা যাবে না এবং এই দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

চার. কর ও রাজস্ব ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে রাজ্য সরকার অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের তহবিলে জমা দেবে।

পাঁচ. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা, যেমন–

ক. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

খ. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

গ. কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে রাজ্য সরকারগুলোই জোগান দেবে।

ঘ. রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না।

ঙ. ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশের সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি সম্পাদন ও বিদেশে ট্রেড-মিশন স্থাপনের যাবতীয় ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলোর হাতে থাকবে।

ছয়. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য পৃথক প্যারা-মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানে একটি অস্ত্রনির্মাণ কারখানা, একটি পূর্ণ সামরিক একাডেমি এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

একনাগাড়ে ছয় দফা বর্ণনা করে একটু বিরতি দিলেন নেতা। তারপর আবার বলেন, এই হলো সংক্ষেপে আমার ছয় দফা। কী বুঝলে বলো।

কফিলউদ্দিন এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিল। নেতা কথা শেষ করার পরও যেন তার ঘোর কাটে না। অনেকক্ষণ পর কফিলউদ্দিন মুখ খোলে, ভাই সাহেব, আপনার ছয় দফায় কিছুই তো বাকি নাই, এ দেশের মানুষের আদি-অন্ত সবই ঢুইকা পড়ছে। আপনার থেকে আর কে এ দেশের মানুষের স্বার্থ ভালো বুইঝতে পারে! এ জন্যই আপনি বাংলার মানুষের নয়নের মণি। অধমরে আপনার পায়ের একটু ধুলা দেন হুজুর।

বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে নেতার পায়ের দিকে এগিয়ে যায় কফিলউদ্দিন। নেতা 'করো কী করো কী' বলে দ্রুত সরিয়ে নিলেন নিজেকে।

কারাগারে কয়েদিদের অনেকেই এখন নেতার কথা জানে। কফিলউদ্দিনের মতো কারাগারেও অনেকে ছয় দফা নিয়ে আপ্লুত। তাদের মাধ্যমে নেতা বাইরের ভালোমন্দ খবর পান। পত্রিকার সংবাদে তিনি জেনেছেন অন্য দলের কোনো কোনো বাঙালি জ্যেষ্ঠ নেতা ছয় দফার সমালোচনা করছেন, ছয় দফার ভুল ব্যাখ্যা করে জনগণকেও বিভ্রান্ত করছেন। তারা বলছেন ছয় দফা নাকি পাকিস্তান ভাঙার মন্ত্র।

এসব বিরুদ্ধ সমালোচনায় নেতা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। তিনি ওসব জ্যেষ্ঠ নেতাকে ভালো করে চেনেন। তারা লক্ষ্যহীন, সুবিধাবাদী। ঘোলাজলে মাছ শিকারের ধান্দায় থাকে। জনগণের সমর্থন তারা কোনোদিন পাবে না।

নেতা প্রচণ্ড আশাবাদী। তাঁর আশা ও শক্তির জায়গা দেশজোড়া নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মী। তিনি জানেন তাঁর দলের অন্য নেতাকর্মীরা ছয় দফার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণে। এরই মধ্যে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন কত কর্মী। কত প্রিয় সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করে এই কারাগারে আনা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ নেই এদের কারোরই। তবু তিনি বুঝতে পারেন কর্মীদের কত দুর্গতি, কত দুর্ভোগ! তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মানুষ এসব সহ্য করছে নীরবে। অথচ এখন কিছুই করার নেই তাঁর। একা একা যেন মর্মে মর্মে জ্বলে পুড়ে মরেন। খেতেও মন চায় না।

অবশ্য এখানকার খাবারও যেমন তেমন, অনেক সময় মুখে তোলা যায় না। মাঝে মাঝে তাই কিছুই খান না। তখন বাবুর্চি কেরামত মিয়া এসে অস্থির করে তোলে, স্যার, আরেকটু নেন, একটু মাছ, একটু তরকারি। এত বড়ো শরীর, আধপোয়া চালের ভাতও না খেলে বাঁচবেন কেমন করে?

নেতা কেরামতের দিকে তাকিয়ে থাকেন চুপচাপ। মনে মনে ভাবেন, তোমাদের এ স্নেহ-মমতার প্রতিদান আমি কী দেব!

একদিন কেরামত বলে, স্যার আপনি হয়ত জানেন, এখানে দুই-তিনশো কয়েদি থাকে। কিন্তু আপনি কি জানেন, তারা নামাজ পড়ে আপনার জন্য দোয়া করে প্রতি ওয়াক্তে। তারা বলে, আপনি ক্ষমতায় থাকলে তাদের আর চিন্তা থাকত না।

নেতার বুকের ভেতর থেকে যেন একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হঠাৎ, আমার এ জীবনটা কি কোনোদিন এসব মানুষের কাজে লাগবে? মাথা নিচু করে শপথ নেওয়ার ভঙ্গিতে নিজের বুকে হাত রেখে বসে থাকেন নেতা।

ছয় দফার পক্ষে দেশব্যাপী প্রচারণা চলছে নিয়মিত। স্থানীয় নেতাকর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে জনমত গড়ে তুলছে। যত দিন যায় ততই ছয় দফার আন্দোলন জোরদার হয়। ছয় দফার প্রতি মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন দেখে সরকার সন্ত্রস্ত। কঠোর হাতে আন্দোলন দমনে মরিয়া হয়ে ওঠে। আর ওদিকে কারাগার থেকে নেতার মুক্তির সম্ভাবনা তলিয়ে যায় অনিশ্চয়তার অতলে। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। দুই মাস, ছয় মাস, এক বছর, এমনি করে প্রায় দেড় বছর সময় বয়ে যায়।

এসময় একঘেঁয়ে জীবনে অন্যরকম এক আনন্দ যোগ হলো হঠাৎ। দলের প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমিন অ্যাডভোকেটকে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে এই কারাগারে এবং তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো নেতার পাশের ঘরে। এতে নেতার দীর্ঘ সময়ের একাকিত্ব ঘুচল কিছুটা। এখন সময় কাটে দুজনের আলাপ-গল্প শলা-পরামর্শে।

মাঝে মাঝে স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা দেখা করতে আসে নেতার সঙ্গে। ছয় দফার প্রতি মানুষের তুমুল আগ্রহের কথা শোনায়। নেতা আরও আশান্বিত হয়ে ওঠেন। এভাবে চলতে থাকলে ছয় দফা রূপান্তরিত হবে এক দফায়– আর তা হলো স্বাধীনতা। সরকারের ভয় ঠিক এখানটায়। এজন্যই সরকার নেতাকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, আটকে রাখতে চায় কারাকুঠুরিতে। এদিকে দেশরক্ষা আইনে আরও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে অনেক সামরিক, সিএসপি ও সাধারণ নাগরিককে। কোন ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা হচ্ছে কে জানে?

আজ দুপুরের পরে একটু বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু গরম কমছে না। বাতাসও যেন জেলখানা চেনে, পারতপক্ষে এইমুখো হতে চায় না। এর মধ্যেই বিকল হয়ে গেল ঘরের বিজলি পাখাটা। জেল অফিসে সে খবর দিয়ে নেতা চেয়ার নিয়ে বসে থাকলেন ঘরের সামনের বারান্দায়। মোমিন সাহেবও এসে বসলেন নেতার পাশে।

সন্ধ্যার আগে বিজলি পাখা ঠিক করে দিয়ে গেল। বই পড়তে পড়তে অনেক রাত। ঘুম আসছে না। নেতার হঠাৎ বৃদ্ধ বাবা-মার কথা মনে পড়ল। আহা, কতদিন দেখা হয় না। জেল থেকে বেরিয়ে কি তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে? খোদা, তুমি আব্বা-আম্মাকে বাঁচিয়ে রেখো, সুস্থ রেখো। মোনাজাত করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন নেতা।

১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি। রাত বারোটার পর হঠাৎ নেতার মাথার কাছের জানালায় বাইরে থেকে টোকা পড়ার শব্দ। কে বা কারা তাঁকে ডাকছেন। বিছানা থেকে উঠে তিনি দেখেন, নিরাপত্তা বিভাগের ডেপুটি জেলার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নেতাকে বললেন, আপনার মুক্তির আদেশ দিয়েছে সরকার।

–মুক্তি! এত রাতে! নেতার বিশ্বাস হতে চায় না। তিনি বললেন, এভাবে কি মুক্তি দেওয়া যায়? মুক্তির কত ফর্মালিটিস আছে, সেসব কিছুই হলো না।

নেতার পাশের ঘর থেকে দলের প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমিন অ্যাডভোকেটও বেরিয়ে এসেছেন এরই মধ্যে। তিনিও কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে অবাক।

ডেপুটি জেলার সাহেব অনড়। তিনি মুক্তির হুকুমনামা দেখালেন। অগত্যা নেতাকে যেতে হলো তার সঙ্গে।

গেটে এসে নেতা কেমন যেন ধাক্কা খেলেন আবার। গেটের বাইরে সামরিক বাহিনীর গাড়ি এবং সামরিক পোশাকে সজ্জিত লোকজন কেন? তিনি ইতস্তত পায়ে ডেপুটি জেলারের কক্ষে ঢুকে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন সামরিক কর্মকর্তা এসে বললেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো। বলেই তিনি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দেখালেন। একটু পর আবার তিনি বললেন, কোনো চিন্তা করবেন না, আপনার মালপত্র আপনি যেখানে থাকবেন সেখানে পৌঁছে যাবে।

নেতা বুঝে গেলেন এ নিশ্চয় সরকারের নতুন ষড়যন্ত্র, মুক্তি আর গ্রেপ্তার গ্রেপ্তার খেলা।

এরপর কোনো খবর নেই। নেতাকে কোথায় নেওয়া হয়েছে, কোথায় তিনি আছেন কেউ জানে না।

তবে নেতার পুনরায় গ্রেপ্তারের খবরটি পরদিন সকালেই ছড়িয়ে পড়ল কারাগারের ভেতরে। কারাগারে দাঁড়িয়ে আবদুল মোমিন অ্যাডভোকেট, কফিলউদ্দিন মাস্টার, রহমতউল্লাহ, কেরামত মিয়াসহ কয়েদিরা শুনতে পেল বাইরে ক্ষুব্ধ জনতার স্লোগান–'আমার নেতা তোমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব'...।

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

শেখ মুজিব এক অসামান্য কবিতা

আবুল কালাম আজাদ

কবি না হয়েও তোমাকে নিয়ে
অনায়াসে লিখে ফেলা যায় মহৎ কোনো কবিতা

তুমি আমাদের হিমালয়সম অহংকার
তুমি আমাদের বিশ্বের তামাম গোলাপসম ভালোবাসা
তুমি আমাদের এক আকাশ থমথমে মেঘসম বেদনা
তাই তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখতে শব্দের অভাব নেই
আমাদের কারও কাছেই

চৈত্র দিনে মধ্য দুপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপসম সূর্য
শাপলাফোটা শান্ত-স্তব্ধ পদ্মপুকুর
বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠ
বর্ণালিসব পাখির বিচিত্র সুরেলা গান
বাংলার ঘাটে-মাঠে, বনে-প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা
অগণিত সুভাসিত রূপময় ফুল
সবই হতে পারে তোমার উপমা-চিত্রকল্প

তোমার বুক মানে আকাশ
তোমার কণ্ঠ মানে মেঘের গর্জন
তোমার হৃদয় মানে ফেনায়িত সাগরের
অনিঃশেষ ঢেউয়ের মতো একের পর এক
আছড়ে পড়া ভালোবাসা–
ভালোবাসা দেশ আর মানুষের জন্য
যে ভালোবাসার জন্য তুমি শান্ত-স্থির চিত্তে
বুকে তুলে নিয়েছ বুলেট
তোমার বুকের রক্তে উর্বর করেছ বাংলার পলিমাটি
আপন দেহের সুদীর্ঘ ছায়ায়
ঢেকে দিয়েছ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত আটানব্বই বর্গমাইল

তুমি মানে বাংলাদেশ
তুমি মানে লাল-সবুজের পতাকা
তুমি মানে– 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'
তুমি মানে বঙ্গবন্ধু
তুমি মানে জাতির পিতা

তাই কবি না হয়েও তোমাকে নিয়ে
অনায়াসে লিখে ফেলা যায় দুর্দান্ত সার্থক কবিতা
শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প, অনুপ্রাস
কোনো কিছুতেই সম্ভাবনা নেই দ্বন্দ্বের
তিল পরিমাণ পতন হয় না ছন্দের।

মুজিব তুমি

আবু তৈয়ব মুছা

মুজিব তুমি আবার এসো
বিজয় নিশান হাতে,
হুংকার দাও হায়েনাদের
ওরা আছে ওত পেতে।

সেবক সাজার বড়ো সখ
হতে চায় নেতা
পাকিস্তানের পরাজয়ে
তাই তো মাথা ব্যথা।

তুমিই পারো দিতে মোদের
সবার সফলতা,
কণ্ঠে তোমার স্বাধীনতা
হাতে বিজয় পতাকা।

মুজিব তুমি আবার এসো
এই নীলাকাশের ছাদে,
তোমা বিনে সবুজ গ্রাম
দেখো, আজও কাঁদে।

এত জল পৃথিবীতে ছিল

দুখু বাঙাল

লজ্জা শব্দটি বড়ো বেশি পরিচিত সর্বত্র সকলেরই সাথে
দেহের পরশে ধন্য উচ্ছ্বসিত ভরানদী তুমিও যেমন
লজ্জার ছায়ায় বুঝি কোনোদিনও দাঁড়ায়নি তোমার শরীর
আত্মার দূরত্ব তার বহু দূর– দ্বারকার অজানা দুয়ার।

সীমাবদ্ধ প্রাচীরে ঘেরা থাকে মানুষের অঙ্গ পরিচয়
তারও চেয়ে ঢের বেশি বন্দি আজ তোমার হৃদয়
দূর দ্বীপ নির্বাসনে ছুঁড়ে দিলে একরাশ অবজ্ঞার হাসি
আলোর বিমের মাঝে ধূলিকণায় ছুটে চলে দীপ্ত মহাকাল।

রশ্মির বিস্তার ভেঙে অবিশ্রান্ত ছুটিতেছে বিবাগী দেয়াল
অতঃপর আপনা থেকে হয়ে উঠে লজ্জার অখণ্ড ভাসান
ক্ষীণস্বরে সমুদ্রকে বলতে থাকো– এত জল পৃথিবীতে ছিল!
সঙ্গমে সের পোরে ভালোবাসায় চিরদিন অপূর্ণ মাসান।

মধুমতী

ওমর ফারুক নাজমুল

এই নদীটার শান্ত মেজাজ চলে নিরবধি
যাই ছুটে তার কাছে মনটা হারায় যদি
মধুমতী নাম যে তার বন্ধু ছেলেবেলা
তার সাথে সুখস্মৃতি দেখি ঢেউ খেলা।

তার বুকে বান ডাকে আসে জলোচ্ছ্বাস
সবুজ জলে ভাসে নাও কাটে বারোমাস
পালের বাদাম ছেড়ে উড়াই মনের কেতু
কালানাঘাটে খেয়া হালে সুখ সেতু।

গড়াই থেকে জন্ম নিয়ে এঁকেবেঁকে যায়
হরিণঘাটায় সাগর পাড়ে থমকে দাঁড়ায়।
দুই তীরে সারাবেলা দোলে কাশফুল
ছিপ ফেলে মাছ ধরে তাই মশগুল।

পদ্মাসেতু তোমার-আমার

জাফরুল আহসান

পদ্মা নদীর ভয়াল স্রোত এক নিমিষে গুড়িয়ে দিলো
বসত-ভিটা, ফসলিজমি– যা কিছু সব স্বপ্ন ছিলো;
তারপরেও পদ্মাপাড়ের মানুষগুলো নতুন করে
স্বপ্ন বুনে–বাঁচতে শেখে সবাই মিলে হাতটি ধরে।

পদ্মা ঘিরে সেতু হবে, স্বপ্নঘড়ি হাওয়ায় ওড়ে
আকাশছোঁয়া ভাবনাগুলো মেললো ডানা-ঐ সুদূরে;
গাঁয়ের চাষা, মাঝিমাল্লার আমজনতা আঁকলো ছবি
দুকূল বেয়ে সেতু হবে, হাজার ছবির একটি ছবি।

দুহাত ভরে স্বপ্নগুলো ভাগ করে নেয় সবাই মিলে
আঁধার কালো মেঘের ভেলা ভিড় জমালো অস্তাচলে;
এমনি করে ভাবনাগুলো নদীর জলে সাঁতার কাটে
বলছে হেসে– সেতু হলে চলবে গাড়ি খেয়াঘাটে।

ছবির কবি জানিয়ে দিলো দিন বদলের নাগরদোলায়
সবাই মিলে পদ্মাসেতু বানিয়ে নেবো পরম মায়ায়;
নিবিড় ছোয়ায় গড়বো সেতু, লক্ষ প্রদীপ জ্বালবে আলো
নতুন করে পাবে জীবন পদ্মাপাড়ের মানুষগুলো।

আকাশছোঁয়া স্বপ্ন আহা সত্যি হলো সোনার দেশে
পদ্মাপাড়ের এপার-ওপার এক হলো যে ভালোবেসে;
দেশের গর্ব, গর্ব জাতির, গর্ব আমার ভালোবাসার
হাজার ছবির একটি ছবি পদ্মাসেতু তোমার-আমার।

চাই ফিরে সেই অরণ্যানী

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

অনেক কিছু ছিল আমার গর্ব করার মতো
এই মাথা তাই হয়নি নিচু, থাকত সমুন্নত।

আছে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং আছে নিজের ভাষা
এই দেশটির মূল চালিকা কৃষক মজুর চাষা
আছে সবুজ বনবৃক্ষ
দীর্ঘ সুনীল অন্তরিক্ষ
সাগর-পাহাড়
রূপ সমাহার
আছে সবুজ ঘাস
সাত পুরুষের এই জমিনে আমার বসবাস।

অনেক কিছু আছে আমার, গর্বিত হই তাতে
নিজের দেশে থাকা মানে বাস করা জান্নাতে
সেই জান্নাত নিজের হাতে আমরা করি শেষ
পূর্বকালের মতন এখন নেই যে বাংলাদেশ।

রুদ্ধ করে নদীর গতি
পরিবেশের কত ক্ষতি
করছি আমরা প্রতিদিনই, তা ভাবি না কেউ
নদীর বুকে তাই দেখি না সেই কলকল ঢেউ।

ভরাট করি পুকুর-ডোবা
নেই পরিবেশ মনোলোভা
গাছগাছালি উজাড় করে বানাই মরুভূমি
সেই সুন্দর দেশটা খুঁজে আর পাবে না তুমি।

গর্ব করার সব উপাদান আমরা করি শেষ
চাই ফিরে সেই অরণ্যানী সবুজ বাংলাদেশ।

মাঠ ও মেঘ

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

মাঠ বলে, ওহে মেঘ চেয়ে দেখো
দিন দিন কেন যেন রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যাচ্ছি
আমি ফেটে হচ্ছি চিরচির, বেড়ে যাচ্ছে জলের তিয়াস,
অনাবাদী হয়ে যাচ্ছে মাটি
বহুদিন পাইনি তো লাঙলের ফলার আরাম
একদম ভুলে যাচ্ছি, ফসল উৎপাদনের স্বাদ ।

আকাশের বুক দিয়ে সাদা-কালো মেঘ
হেঁটে যেতে যেতে বলে ‘ও’ মাঠ বলো না
আর কটা দিন সবুর করো
তারপর বৃষ্টি হয়ে নেমে এসে
ভালো করে ভিজাবো তোমাকে
ঘুচে দেব জলের পিপাসা, মুছে দেব সকল ফাটল
চিন্তা করো না। কৃষক তোমাকে আবার
আগের মতোই করবে আবাদ
সবুজে উঠবে ভরে তোমার শরীর।

শান্তিতে ঘুমাও বাবা

ইসলাম সাইফুল

তোমার কথা খুব কম উচ্চারিত হয়।
তোমার সাথে আমার পরিচয় কখন থেকে!
শৈশবে দেখতাম শনিবার রাতে এসে আবার চলে যেতে।
রবিবার তোমার সাথে আমার কিছুক্ষণ।
অন্যদিন মা গোসলখানায় গামছা দিয়ে যে রগড় দিতো।
মাথায় দিত সাবান দিয়ে আরও শক্ত নাড়া।
সাবানের ঝাঁজ চোখে আসত।
কিন্তু রবিবারটা ছিল তোমার সাথে গোসল।
তোমার হালকা হাতে পিঠ ঘষে ঘষে বলতে লাগছে তোমার।
আমার শরীর নিয়ে যেমন চিন্তিত ছিলে তেমন লেখাপড়া নিয়ে নয়।
ভাইবোনরা যখন স্কুলে ভালো ফলাফল করে আসত
ঠিক তখন আমাকে তেমন কিছুই বলতে না।
আমার শৈশবের সময়ে তুমি বলে ছিলে
লেখাপড়া করার চেয়ে মানুষ হওয়া জরুরি।
রিকশায় যেতে যেতে বলতে
ঐ যে পথের ধারে ছোটোশিশু তার চেয়ে আমি বেশি সুযোগ পাচ্ছি।
সত্যিই তাই ছিল তুমি আমাকে ভর্তি করেছিলে দামি স্কুলে।
আমার পাঁচ ভাইবোন মিলে যে বেতন দিতে না তার চেয়ে বেশি বেতন ছিল আমার স্কুলে ।
আমাকে তুমি শৈশবেই কিনে দিতে দামি ইংরেজি ছড়ার বই।
অনেক গল্প করতে আমার সাথে।
তোমার শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত শতাব্দির কথা।
তোমার মা তোমাকে ছেড়ে চলে যায় শৈশবে।
দাদা আবার বিয়ে করেন।
কিন্তু তোমার মুখে সৎ ভাইবোন মায়ের কথা কখনো বুঝতে দাওনি।
সব কিছুই তুমি বিচার বিশ্লেষণ করে কথা বলতে।
গল্প করতে ভালোবাসতে তুমি।
কিন্তু আমি যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখনই তোমার চলে যাওয়ার সময়।
আমি নিজেই সেই রাতে তোমার কবরের পাশে ছিলাম।
আমি যেন বেশ বড়ো হয়ে গেলাম। কারণটা তুমিই।
আমাকে নিয়ে ঈদের খাসি কেনা।
পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র তখনই সাইকেল কিনে দিলে।
আমাকে এত দিলে যে আমার কাছে এখন সব অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।
তোমার সাথে স্কুল ভিজিটে নিয়ে গেলে ত্রিশাল।
দরিরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি তোমার সময়েই জুনিয়র স্কুল হয়।
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সর্ম্পকে জানতে আমাকে দেখালে সব।
তুমি ভীষণ ভালো ফুটবল খেলতে।
সেই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তুমি বিএ পাস করলে।
তোমার কাছে ধর্মান্ধতা ছিল না।
তুমি ছিলে নারী প্রগতির পক্ষে।
আমি মা তুমি সবাই মিলে রূপবান ছবি দেখেছিলাম।
নাটক তোমার প্রিয় ছিল।
বুবু যখন রূপা চরিত্রে অভিনয় করে মুসলিম গার্লস স্কুলে তখন তুমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলে।
আচ্ছা বাবা তুমি এখন কোথায়! অনেক দূরে।
আমায় তুমি কি বেশি ভালোবাসতে ? জানি না !
এতটুকু জানি অনেক বেশি আদর করতে আমাকে।
আমি যখন কুকুর ছানা পুষি তখন তুমি তার নাম রেখে দিলে ব্রেভো।
কিন্তু নিজের জীবন কাটালে অনাড়ম্বরভাবে।
একটা ঘড়িও কিনোনি তুমি।
দামি শার্ট পরোনি কোনোদিন।
আজ ব্যাংক থেকে আমাকে গোপন প্রশ্ন ছিল মায়ের নাম।
কিন্তু কখনো জানতে চায়নি বাবার নাম কি !
কেন জানি না।
কিন্তু বাবা আমার বাবা ।
অসাধারণ একজন মানুষ।
নদী ও জল থেকে উঠা এক প্রগতির পক্ষের মানুষ।
শান্তিতে ঘুমাও বাবা।

অনন্য বাবা

আহমদ সলীম

এক বছরে একটি দিবস
বাবার জন্য রাখা
বাবার কথায় মনটা বিবশ
লাগছে কেবল খাঁ খাঁ।
সারাজীবন টানল বাবা
সংসারের এক ঘানি
দরিদ্রতার অসুর থাবা
নিত্য দেয় হাতছানি।

বাবা ছিলেন মহিরুহ
সবার শীতল ছায়া
অপচ্ছায়া রুখতে ব্যূহ
কী যে পরম মায়া!
সকল সন্তান মানুষ করতে
দৃঢ় প্রত্যয় বাবার
নিপুণ হাতে সুযোগ গড়তে
জীবনটা তাঁর কাবার।

এই দিবসে বাবার জন্য
আকুল প্রার্থনা
আত্মার শান্তি এক অনন্য
স্বর্গ রচনা।

সাম্যের সুর

আলমগীর কবির

ভোরবেলা ঘুম ভাঙে মধুর আজানে,
মসজিদে ছুটে যান নামাজে, বাজানে।
বাজানের সাথে সাথে যাই মসজিদে,
বুকে বুকে যায় মানবতা বোধ জিতে।

বাড়ি ফিরে দলবেঁধে গোসলের ব্যস্ততা,
রান্নার কাজ যত মার হাতে ন্যস্ততা।

খাবারের পরে সাজি পাঞ্জাবি-টুপিতে,
দান কিছু করা চাই আজ চুপিচুপিতে।

তারপর ঈদগাহে মিলনের উৎসব,
দূর হলো ব্যবধান আর যত খুঁত সব।

তারপরে বাড়ি ফিরে দিতে হবে কোরবানি,
চারদিকে শুনি আজ সাম্যের সুর-বাণী।

ঈদ এলো

মাহমুদা দিনা

ঈদ এলো! ঈদ এলো!
ঈদ এলো ধরাটায়
এই খুশি এঁকে যাই
আজকের ছড়াটায়।
ঈদ খুশি ঈদ হাসি
ঈদটাকে ভালোবাসি
ঈদে হয় মজা বেশ
আজকের ছড়া শেষ।

বর্ষার গড়াই রূপ

বেগম শামসুন নাহার

গরবিনী পদ্মার কন্যা 'গড়াই'
দেখেছে কত চড়াই-উতরাই
কখনও ভরা বরষায় ভরা যৌবনা
চপলা চঞ্চলা ঘোর উন্মাদনা।

কত সোহাগ যতন, প্রেম-ভালোবাসা,
হতাশা-যুদ্ধ স্বাধীনতার আশা।
প্রবল খরস্রোতে ধুয়ে মুছে দিতে হবে তাও জানা–
ধরণিতে জমে থাকা যত আবর্জনা-পাপতাপ
জরা ধুলো বালুকণা।

অবশেষে রেখে যাওয়া করুণ আর্তনাদে;
চিহ্ন পলিকণা স্মৃতিতটে
সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা
বনবিথী ঘেরা চির সবুজের এই বাংলা।

তোমার ও পথ

এম ইব্রাহীম মিজি

তোমার ও পথ কেন এত কণ্টকাকীর্ণ?
পা বাড়াতেই রক্তাক্ত হয় চরণতল!
যে রক্তের ছোপ লেগে রয় মাটির বুকে
জানি না মহাকাল প্রতিশোধ নেবে তা
–কীভাবে?
আজ ইচ্ছে করেই তাড়িয়ে দিয়েছি চাঁদটিকে
আমার আঙিনায় তার দেহ-লাবণ্য ছড়িয়ে
নরম আলো ঢালবে বলে এসেছিল–
রুপালি চাদর জড়িয়ে।

তার অরূপ বদনখানি মলিন হলেই বুঝি বাঁচি
এই গহীন-স্মৃতির ভার আর যে বইতে না'রি;
ভেবেছি এবার খুব দূরে যাবো, দূরে অনেক দূরে
খুঁজে পাবে না তুমি, পাবে না তোমার স্মৃতিকাপালি;
আড়ালে আড়ালে আড়াল হবো সময়ের আবডালে।

ক্ষুদ্র হৃদয়ের দৌর্বল্য স্বীকার করে হয়ত বা কোনোদিন
এসে সঁপে দেবো তোমাতে আমার এ জীর্ণ আমিটিকে;
হৃদয়ের গোপন কন্দরে উঠবে জ্বলে হয়ত সেদিন
আমার নিভে যাওয়া ব্যর্থ প্রেমের প্রদীপখানি।
প্রতীক্ষায় তাই আজও এই আমি–
যাপিত গোপন কষ্টের এ দীঘল রজনী।

স্বাগত বর্ষা

রুস্তম আলী

স্বাগত বর্ষা স্বাগত শ্রাবণ
সূর্যের প্রখর তাপে যখন উত্তপ্ত ধরণি
এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষমাণ প্রতিটি ধূলিকণা
এক পশলা বৃষ্টি প্রকৃতিতে শান্তির বন্যা।
বর্ষার জলে মানুষের মন, মাটির উর্বরতা ত্বরান্বিত হয়।
বর্ষাস্নাত মাটির গন্ধে হৃদয় দোল খায়।
ফসলের ক্ষেত সবুজে ভরে যায়।
অচেনা মানুষ চেনা মনে হয়।
স্বাগত বর্ষা, স্বাগত।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

এডিস মশা ডিম পাড়ার ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

বঙ্গবন্ধুর জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবন ছিল শান্তির সাধনায় উৎসর্গকৃত। ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে ঢাকা শান্তি সম্মেলনে পদক গ্রহণোত্তর ভাষণে তিনি তাই যথার্থই ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর জীবনের মূলনীতিই হলো শান্তি। তিনি যে মুক্তিসংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, ছিল বাংলার শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের জন্য শান্তির স্বপ্নও। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি সব সময়ই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষদের সমর্থন করেছেন, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শান্তির দর্শন আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছরপূর্তি উপলক্ষে ২৮শে মে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত শান্তিময় বিশ্বের। আলজেরিয়ায় ন্যাম সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। শোষক আর শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।' বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের চিরন্তন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে একটি অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানান রাষ্ট্রপতি।

পুলিশকে আরও জনবান্ধব হতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে আরও জনবান্ধব হতে হবে। পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন ২৮শে মে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ নির্দেশনা দেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন, পুলিশকে জনগণের বন্ধু হিসেবে কাজ করতে হবে। পুলিশ সদস্যদের কাজ যাতে জনবান্ধব হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জনস্বার্থে বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলেরও নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে সাইবার ক্রাইম বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাইবার ক্রাইম মোকাবিলায় পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে প্রযুক্তি জ্ঞানে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, সাম্য ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর কালজয়ী লেখায় ঋদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। নজরুল ছিলেন একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক। কবির লেখনী শোষিত-নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ে আমাদের সোচ্চার করে, শিক্ষা দেয় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসানে তিনি অবতীর্ণ হলেন তূর্যবাদকের ভূমিকায়। শতবর্ষ পূর্বে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সংগ্রাম যখন জোরদার হচ্ছিল নজরুল তখন অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের পটভূমিতে রচনা করেন *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থ।

২৮শে মে ২০২৩ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন-এর সাথে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন সাক্ষাৎ করেন –পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশের দুর্যোগঘন সময়ে নজরুলের *অগ্নিবীণা* গ্রন্থের কবিতাসমূহ জনমানসকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। একদিকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গাকে প্রশমিত, অন্যদিকে জনমানসকে উজ্জীবিত করার জন্য লিখলেন– 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'কামালপাশা', 'আনোয়ার', 'রণভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়া পারের তরণী', 'কোরবানী', 'মহররম'– এই বারোটি কবিতা। কবিতাগুলোতে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে সমানভাবে ধারণ করেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৫শে মে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কঠিন নিগূঢ় কবির বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে পারেনি। নিজের ওপর ছিল তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস এবং সত্যের প্রতি তাঁর ছিল অবিচল আস্থা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা

জুগিয়েছে নজরুলের কবিতা ও গান। আমি আশা করি, নতুন প্রজন্ম নজরুল চর্চার মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবে এবং দেশপ্রেম, সততা ও নিষ্ঠা দিয়ে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করবে।

প্রতিবেদনঃ মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন করতে সক্ষম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৭৬১,৭৮৫ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। কারণ, তাঁরা তাঁদের সক্ষমতা আগেই দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো আকারের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে মে বঙ্গবন্ধু 'আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস-২০২৩' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শহিদ ও আহত শান্তিরক্ষীদের সম্মাননা প্রদান করেন –পিআইডি

জাতীয় বাজেট দিয়েছি এবং আমরা এই বাজেট বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রী ৪ঠা জুন ২০২৩ ঢাকা-চিলাহাটি রুটে নতুন আন্তঃনগর ট্রেন 'চিলাহাটি এক্সপ্রেস'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষায় গাছ লাগান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষায় বৃক্ষরোপণ করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। ৫ই জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণকালে এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

পরিবেশ মেলা ২০২৩, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০২৩-এর উদ্বোধনের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ৩টি চারা রোপণ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবসে আমি গাছ লাগিয়েছি। আমি আশা করি, বাংলাদেশের সবাই (জনগণ) এটি (গাছ লাগাতে) অনুসরণ করবেন।

বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পরিপ্রেক্ষিতে ফলমূল, শাকসবজি ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতিটি স্থানে গাছ লাগাতে এবং প্রতিটি এলাকাকে উৎপাদনের আওতায় আনতে প্রধানমন্ত্রী জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি দেশের প্রত্যেককে তিনটি গাছ লাগাতে অনুরোধ করতে চাই এবং যদি তা সম্ভব নাও হয়– তবে অন্তত একটি গাছ লাগান। এ ছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে গাছ লাগাতে বলেন।

বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে শান্তিরক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে গৌরব ও মর্যাদা লাভ করেছে। ২৯শে মে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জাতিসংঘে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। নারীর অধিকার এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে আমাদের প্রচেষ্টা উইম্যান পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাণীতে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, শান্তিরক্ষী সদস্যগণ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে তাদের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, সাহস ও নিষ্ঠা দ্বারা বাংলাদেশকে বিশ্বে একটি শক্তিশালী শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করবেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং একই বছর ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, 'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি অত্যন্ত জরুরি এবং তাহা সমগ্র বিশ্বের নর-নারীর গভীর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন ঘটাইবে।' সাধারণ অধিবেশনে তিনি বিশ্বের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থনের বিষয়ে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তখন থেকেই বাংলাদেশ বিশ্বের শান্তিপ্রিয় ও বন্ধুপ্রতীম সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছে এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের অধীনে পরিচালিত সকল শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৩

সালের ২৩শে মে 'জুলিও কুরি শান্তি পদক'-এ ভূষিত করা হয়। বাণীতে প্রধানমন্ত্রী 'আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস ২০২৩' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য এবং সকল শান্তিরক্ষীর সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করেন।

সন্তানদের পড়াশোনায় আরও বেশি বিনিয়োগ করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুসলিম উম্মাহর হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে তাদের সন্তানদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান। ৩০শে মে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি)-এর ৩৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইসলামের স্বর্ণযুগে বিশ্ব সভ্যতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলসহ জ্ঞানের আরও অনেক শাখায় মুসলিম স্কলারদের ব্যাপক অবদান রয়েছে, যা আমাদের মুসলিমদের ঐতিহ্যের গৌরবময় ইতিহাস গড়েছে। সে যুগের মুসলিম স্কলাররা সংস্কৃতি, জ্ঞান অর্জন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সমসাময়িক সাহিত্যে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির অভাব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাব এবং অন্যান্য অনেক বিষয় মুসলিম উম্মাহর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি মনে করি, এ হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের মুসলিম উম্মাহকে মতভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোকে বিশেষ করে তাদের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও বিজ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে হবে।

সমাবর্তনে ২০২১ এবং ২০২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের স্নাতক, মাস্টার্স, পিএইচডি এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের অসামান্য ফলাফলের জন্য দুই ধরনের স্বর্ণপদক– আইইউটি স্বর্ণপদক এবং ওআইসি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর অর্থায়নে আইইউটির নবনির্মিত নারী হলেরও উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ আর কোনো সংঘাত চায় না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ আর কোনো সংঘাত চায় না, বরং জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি চায়। তিনি বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন থেকে অব্যাহত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশের কারণে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে। ২৮শে মে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদানের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ২০০৮ সালের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর পরিকল্পিতভাবে দেশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে আমরা দারিদ্র্যের হার এবং মাতৃমৃত্যু হ্রাস করতে, শিক্ষার হার এবং মানুষের গড় আয়ু বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। দেশে বিরাজমান টেকসই ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশই বাংলাদেশের অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক অগ্রগতির একমাত্র কারণ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন, সারাজীবন শান্তির বাণী প্রচার করেছেন, কিন্তু তাঁকে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। আজ তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, তবে আমরা চাই যে, তাঁর দেশ উন্নত এবং সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ে উঠুক।

কবি নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবোধের মূর্ত প্রতীক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মে পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। অসামান্য ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবোধের মূর্ত প্রতীক। ২৫শে মে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানবতা, সাম্য ও দ্রোহের কবি নজরুলের আজীবন সাধনা ছিল সমাজের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং মানুষের সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি অর্জন। নজরুল জন্মেছিলেন এবং বেড়ে উঠেছিলেন একটি পরাধীন সমাজে। পরাধীনতার গ্লানি তিনি উপলব্ধি করেছেন মর্মে মর্মে। এ ছাড়াও তিনি অন্যায়, অসত্য, নির্যাতন-নিপীড়ন, নানামাত্রিক অসাম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে যুগে যুগে প্রতিবাদ প্রতিরোধের অনাবিল প্রেরণা জুগিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন কবির প্রতি একান্ত অনুরক্ত। স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে কবিকে কলকাতা থেকে বাংলাদেশে এনে জাতীয় কবির সম্মানে অধিষ্ঠিত করা হয়। কবি নজরুল যে অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন, তারই প্রতিফলন আমরা পাই জাতির পিতার সংগ্রাম ও কর্মে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল গণমাধ্যম অপরিহার্য

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, স্বাধীন, স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল গণমাধ্যম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক এবং গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য অপরিহার্য। একইসঙ্গে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজকে গণমাধ্যমের স্বাধীন বিকাশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের এক অনন্য উদাহরণ। ২৩শে মে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ১৮তম এশিয়া মিডিয়া সামিটের উদ্বোধনী দিনে 'অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশনে বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এশিয়া-প্যাসিফিক ইনস্টিটিউট ফর ব্রডকাস্টিং ডেভেলপমেন্ট (এআইবিডি) আয়োজিত সম্মেলনের এ অধিবেশনে কম্বোডিয়ার তথ্যমন্ত্রী Khieu Kanharith, মিয়ানমারের তথ্যমন্ত্রী Maung Maung Ohn, সামোয়ার যোগাযোগ, তথ্য ও প্রযুক্তিমন্ত্রী Toelupe Poumulinuku Onesemo এবং ফিজির সহকারী মন্ত্রী Sakiusa Tubuna বক্তব্য রাখেন। তিন দিনব্যাপী এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য–'অর্থনীতিকে আরও টেকসই করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা'।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী এবং দেশে দেশে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত তুলে ধরে তিনি বলেন, আমাদের গণমাধ্যম এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং নীতি দেশের নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে মানুষকে সচেতন রেখেছে। দেশে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে। একইসঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প নিয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিয়েছে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে।

গণমাধ্যম যেমন বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে এবং চিন্তা ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে তেমনি সরকারের দায়িত্বশীলতাও বৃদ্ধি করে উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, সে কারণে বাংলাদেশ সরকার প্রায় দেড় হাজার পত্রিকা এবং কয়েক ডজন টেলিভিশন ও রেডিওকে লাইসেন্স প্রদান করেছে যাতে এই গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের দেশ এবং এশীয় প্রশান্ত অঞ্চল তথা বিশ্বের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়তে সরকার এবং গণমাধ্যম হাতে হাত রেখে কাজ করবে, এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ।

নাটক, টেলিফিল্ম, সিনেমাতে সমাজের জন্য বার্তা থাকা দরকার

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহ্মুদ বলেন, আমরা সব টেলিভিশনকে উৎসাহ দিচ্ছি যাতে তারা বাংলাদেশের শিল্পী, কলাকুশলীদের নিয়ে দেশের কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিরিয়াল বানায়। একইসঙ্গে সেগুলো যেন সমাজকে ভালো জিনিস শেখায়। যে-কোনো সিরিয়াল বা নাটক যেমন বিনোদন দেবে পাশাপাশি যদি সেখানে সমাজ হিতৈষী বার্তা থাকে, তাহলে সেটিকে আমি যথার্থ এবং পরিপূর্ণ মনে করি। ২২শে মে সচিবালয়ে টেলিভিশন নাট্যপরিচালকদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ড বাংলাদেশ-এর নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ডিরেক্টরস গিল্ড সভাপতি অনন্ত হীরা সংগঠনের পক্ষে তিনটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট ডিরেক্টরস গিল্ডের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তি, টেলিফিল্মকে আলাদা ক্যাটাগরিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আওতায় আনা এবং টেলিভিশন মাধ্যমে কর্মরতদের পেশার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তিনি। সহ-সভাপতি মনোজ সেনগুপ্ত বিটিভিতে ডিরেক্টরস গিল্ড সদস্যদের পালাক্রমে কাজে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার প্রস্তাব দেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনার আশ্বাস দেন এবং বলেন, বাংলাদেশে টেলিভিশনের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে নাটকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশি সিরিয়াল বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটি ক্রমবর্ধমান সেক্টর। আমরা বাংলাদেশে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে যথেচ্ছভাবে বিদেশি সিরিয়াল প্রচারের লাগাম টেনে ধরেছি। কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে এক সাথে একটার বেশি সিরিয়াল প্রচার করতে দিচ্ছি না। অনেক দেশের সিরিয়াল দেখানোর জন্য যেমন আমাদের কাছে আবেদন আসে কিন্তু আমরা সবগুলো দেই না কারণ, সেসব দেশের সমাজব্যবস্থা থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থা ভিন্ন। এতে অনেক টেলিভিশন সতর্ক হয়েছে এবং তারা নিজেরা সিরিয়াল বানাচ্ছে। আগে এ বিষয়ে অনুমতির বালাই ছিল না, প্রধানমন্ত্রী আমাকে এ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২২শে মে ২০২৩ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ডিরেক্টরস গিল্ড কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন –পিআইডি

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে আমরা এ ব্যবস্থা নিয়েছি। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার ডিরেক্টরস গিল্ড বাংলাদেশের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানান এবং দেশ ও দশের সেবায় তাদের আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিস্তৃতি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে উদাহরণ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিস্তৃতি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ। আমরা মুক্ত গণমাধ্যমে বিশ্বাস করি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। প্রতিবেশী অনেক দেশেই গণমাধ্যমের এরকম বিস্তৃতি ঘটেনি এবং এমন অবাধ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে কাজ করে না। একই সাথে তিনি বলেন, স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বশীলতাকে যোগ করতে পারলেই গণমাধ্যম সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। আর যদি স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বশীলতা না থাকে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সমাজের ক্ষতি হয়, রাষ্ট্রেরও ক্ষতি হয়। ৩রা মে রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাবে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাব আয়োজিত 'মানবাধিকার সংরক্ষণ ও গণতন্ত্র সম্প্রসারণে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতন্ত্র এবং গণমাধ্যম একে অপরের পরিপূরক। গণমাধ্যম ব্যতিরেকে গণতন্ত্র হতে পারে না। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বচ্ছতা ব্যতিরেকে গণতন্ত্র কখনো পথ চলতে পারে না, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। সে কারণে গণতন্ত্রকে সংহত করতে হলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার গণতন্ত্র ও বহুমাত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশ, ন্যায়ভিত্তিক, বিতর্কভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমের বিস্তৃতি এবং স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছে উল্লেখ করে পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন, গত ১৪ বছরে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনসহ সম্প্রচারে আসা টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা ৩৯টি, খুব সহসা আরও কয়েকটি সম্প্রচারে আসবে। বেসরকারি

টেলিভিশন এবং বেতারের যাত্রাও শুরু হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। আমরা যখন ২০০৯ সালে সরকার গঠন করি তখন টিভি চ্যানেল ছিল ১০টি আর দৈনিক পত্রিকা ছিল সাড়ে চারশো, যা এখন ১২৬০টি। ২২টি বেসরকারি এফএম রেডিওর লাইসেন্স দেওয়া আছে, ১২টি সম্প্রচারে আছে, কয়েক ডজন কমিউনিটি রেডিওর লাইসেন্স দেওয়া আছে যার বেশির ভাগই সম্প্রচারে আছে। অনলাইন গণমাধ্যম কয় শত কিংবা কয় হাজার সেটি একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। ইতোমধ্যে ২ শতাধিক অনলাইন গণমাধ্যমের রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে, পত্রিকা এবং টেলিভিশনের অনলাইনসহ সেটা আরও অনেক বেশি।

এ সময় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আমি সবসময় বলেছি আজকেও বলব, একজন সাংবাদিক, গৃহিণী, চাকরিজীবী, কৃষক অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সব মানুষকে ডিজিটাল নিরাপত্তা দেওয়ার জন্যই এই আইন। অনেক সাংবাদিকও এই আইনে ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য অপসাংবাদিকতার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তিনি বলেন, আজকের আলোচনায় সাংবাদিকরাও বলেছেন, এ আইনের প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের আইন আজকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ করেছে। অনেক দেশে এই আইন আমাদের চেয়ে কঠোর।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ফিল্ম আর্কাইভকে বিশ্বমানে রূপ দিয়েছেন শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ৪৫ বছরপূর্তিতে তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে যে ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেটিকে বিশ্বমানের সংস্থায় রূপ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আজ আমাদের ও বিশ্বের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ, বিশ্ব স্বীকৃত ভূমিকা রাখছে। ১৭ই মে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যসচিব এ সব কথা বলেন। আর্কাইভের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে সাবেক সচিব কামরুন নাহার, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (চলচ্চিত্র) ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, অভিনেত্রী কোহিনূর আক্তার সুচন্দা, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। অতিথিরা ফিল্ম আর্কাইভকে তাদের প্রাণের প্রতিষ্ঠান এবং স্মৃতির সংরক্ষণাগার হিসেবে বর্ণনা করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিল্ম আর্কাইভের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তথ্যসচিব বলেন, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চায় তথ্য এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল ডেটা সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আর এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি যদি প্রাচীন কিংবা দুর্লভ হয় তা অনেক বেশি মূল্যবান। কারণ সেই তথ্য এবং চলচ্চিত্র আমাদের ঐতিহ্য ও পরিচিতির ধারক। ফিল্ম আর্কাইভ সেগুলোই সংরক্ষণ করছে। তিনি এসময় দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর প্রচেষ্টায় সিনেমা হল নির্মাণ ও সংস্কারে ১০০০ কোটি টাকার সহজ ঋণ তহবিল, চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট, ফিল্ম সিটি নির্মাণসহ নানা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেন।

তথ্যসচিব বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ইউনেসকোর স্বীকৃতি লাভের নেপথ্যে ফিল্ম আর্কাইভেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের অডিও-ভিজ্যুয়াল দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য আমরা প্রকল্প নিয়েছি এবং গত ৪৩ বছর ধরে আন্তর্জাতিক ফিল্ম আর্কাইভ ফেডারেশনের সদস্য বাংলাদেশ এখন অনেক বেশি মর্যাদার আসনে আসীন। এর আগে সকালে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শেষে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ফিল্ম আর্কাইভের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন তথ্যসচিব।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কর্মসংস্থানভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর নির্দেশ

উচ্চশিক্ষা শেষে যাতে কর্মসংস্থান হয় সেদিকে লক্ষ রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। ২৯শে মে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে কমিশনের সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ নির্দেশনা দেন। সাক্ষাৎকালে ইউজিসি চেয়ারম্যান কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে এবং আগামীতে যাতে গুচ্ছভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হয় সে ব্যাপারে নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় যেন গবেষণা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয় তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে নির্দেশ দেন তিনি। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করারও কথা উল্লেখ করেন।

নতুন শিক্ষাক্রমে এসএসসি ২০২৬ সালে

নতুন শিক্ষাক্রমে ২০২৬ সাল থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। ২৯শে মে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর আয়োজিত 'স্মার্ট এডুকেশন ফেস্টিভ্যাল'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও

বলেন, নতুন শিক্ষাক্রম পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতে সময় লাগবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। এরপর ২০২৬ সালে গিয়ে এ শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষা দেওয়া শুরু করবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কারিকুলামের নানাদিক বুঝে উঠতে আমাদেরও কিছুটা সময় লাগছে। শিক্ষক, অভিভাবকদেরও অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে। তবে আমরা সৌভাগ্যবান শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত হতে অনেক কম সময় লাগছে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, স্মার্ট শিক্ষার মধ্য দিয়েই স্মার্ট সিটিজেন তৈরি হবে। আর স্মার্ট শিক্ষার বড়ো উপাদান হলো নতুন শিক্ষাক্রম। অনেক পরিশ্রম করে আমরা সকলে মিলে একটা ভালো শিক্ষাক্রম তৈরি করতে পেরেছি। তিনি বলেন, স্মার্ট শিক্ষার কৌশল নির্ধারণে এ এডুকেশন ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হয়েছে। এতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত আমরা পাবো। এর ফলে আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

নতুন কারিকুলামে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির মূল্যায়ন

নতুন কারিকুলামের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২৮শে মে প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। ৩১শে মে থেকে ৬ই জুন পর্যন্ত প্রস্তুতি নিয়ে ৭ থেকে ১৮ই জুন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের।

রুটিন অনুযায়ী, ষষ্ঠ শ্রেণির সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ৭ই জুন বাংলা, ৮ই জুন ইংরেজি, ১০ই জুন গণিত, ১১ই জুন ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ১৩ই জুন ডিজিটাল প্রযুক্তি, ১৪ই জুন জীবন ও জীবিকা, ১৫ই জুন স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ১৭ই জুন ধর্ম এবং ১৮ই জুন শিল্প ও সংস্কৃতি মূল্যায়ন করা হবে। সপ্তম শ্রেণির ক্ষেত্রে ৭ই জুন ডিজিটাল প্রযুক্তি, ৮ই জুন জীবন ও জীবিকা, ১০ই জুন স্বাস্থ্য সুরক্ষা, ১১ই জুন ধর্ম, ১২ই জুন শিল্প ও সংস্কৃতি, ১৩ই জুন বাংলা, ১৪ই জুন ইংরেজি, ১৫ই জুন গণিত, ১৭ই জুন বিজ্ঞান এবং ১৮ই জুন ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের মূল্যায়ন করা হবে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ভূমির নামজারি হবে ৯ দিনে

এখন থেকে দেশের যে-কোনো ভূমির নামজারি ৯ দিনের ভেতরে সম্পন্ন করা হবে বলে ঢাকা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান জানান। বর্তমানে ঢাকা জেলার সব ভূমি অফিসে ৯ দিনে নামজারি নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। শতভাগ অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর গ্রহণ করা হয় এবং অনলাইনে ডিসিআর প্রদান করা হয়। ঢাকার সব ভূমি অফিস ক্যাশলেস ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষে ২১শে মে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের বিষয় তুলে ধরেন। আগে যেখানে ভূমির নামজারির জন্য ৪৫ দিন সময় লাগত সেখানে বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ভূমির নামজারির সময় ১৪ দিনের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, লিজ নবায়নের আধুনিকায়নে ঢাকা জেলা প্রশাসন কার্যকর বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। সরকারি সম্পত্তি রক্ষার্থে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত ৫৬ একর খাসজমি উদ্ধার করা হয়েছে এবং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ের আলোকে ডিজিটাল সংযোগের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয় স্মার্ট ভূমি সেবা দিতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন–স্মার্ট নামজারি, স্মার্ট ভূমি উন্নয়ন কর, রেজিস্ট্রেশন-মিউটেশনের আত্মসংযোগ, স্মার্ট ভূমি রেকর্ড, স্মার্ট ভূমি পিডিয়া, স্মার্ট ভূমি নকশা।

জিআই স্বীকৃতি পেল তুলসীমালা চাল

শেরপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী তুলসীমালা চালের সুনাম দেশের বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত। সম্প্রতি এই চাল জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) বা ভৌগোলিক নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. জিল্লুর রহমান শেরপুর জেলা প্রশাসককে সনদপত্রের জন্য জিআই ফরম ১৪ পূরণে এবং নির্ধারিত ফি প্রদানে চিঠি দিয়েছেন। সাধারণত নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থলের কারণে কোনো পণ্যের গুণগত মানের খ্যাতি তৈরি হলে সেটির জিআই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

জেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এ বছর শেরপুর জেলার পাঁচ উপজেলায় ৭ হাজার হেক্টর জমিতে তুলসীমালা ধানের আবাদ হয়। বাম্পার ফলনে চাল পাওয়া যায় ১০ হাজার মেট্রিক টন। প্রচারের সুবিধার্থে এক কেজি করে প্যাকেট তৈরি করে মোট ১১ হাজার প্যাকেট তুলসীমালা চাল বাজারজাত করে কৃষি বিভাগ। দেশের বিভিন্ন কৃষিমেলায় এ চাল বিক্রি করে এরইমধ্যে সুনাম কুড়িয়েছে এ বিভাগ। প্যাকেটের গায়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়

চালের গুণাগুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে সবাই জানতে পারে। কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে চালটি রপ্তানির লক্ষ্যে কাজ চলছে। ধাপটি সম্পন্ন হলে আনুষ্ঠানিকভাবে রপ্তানির সুযোগ তৈরি হবে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ভৌগোলিকভাবেও শেরপুরের পরিচিতি বাড়বে।

মধ্যপাড়া পাথর খনি উৎপাদনে রেকর্ড

পাথর উৎপাদনে নতুন রেকর্ড গড়েছে দেশের একমাত্র দিনাজপুরের পার্বতীপুর মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)। মধ্যপাড়া পাথর খনি থেকে গত মে মাসে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টনের উপরে সর্বোচ্চ পাথর উত্তোলন করে খনির বর্তমান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)।

গত মে মাসে খনি থেকে মাসিক উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাকে আবারও ছাড়িয়ে পাথর খনির উৎপাদন ইতিহাসে পাথর উত্তোলনের আরও একটি নয়া মাসিক রেকর্ড গড়ল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জিটিসি। গত ২০০৭ সালের ২৫শে মে পাথর খনির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উত্তোলন শুরু হয়। মধ্যপাড়া পাথর খনি থেকে উৎপাদনের নতুন রেকর্ড সৃষ্টির ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খনি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক এবং জীবনযাত্রার উন্নতি হচ্ছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবক তৈরির পাশাপাশি ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে বলে জানান ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। ১০ই মে ২০২৩ সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। এটুআই এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে 'এমপাওয়ারিং ওয়ার্ক ফোর্স ফর দ্য ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভ্যুলিউশন: এ কেস স্টাডি ফর এমপ্লয়মেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভ্যুলিউশন সামিটের আয়োজন করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তিতে শত শত বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা অর্জন করেছি। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতাও আমরা অর্জন করেছি। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য স্মার্ট মানুষের কথা বলেছেন। আগামী দিন রোবট-আইওটি-এআই দিয়ে শিল্পকারখানা চলবে। এ সব প্রযুক্তির জন্য সংযুক্তির মহাসড়ক তৈরি করতে হবে। আমরা সেই প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি। নতুন শিল্পবিপ্লবের সংযুক্তির মহাসড়ক হিসেবে আমরা ৫-জি পরীক্ষা করে তার উদ্বোধনও করেছি।

মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কারিগর হিসেবে উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রযুক্তি হোক বা জ্ঞান হোক তোমরা বা তোমাদের নিজেদের মতো করে তা গ্রহণ এবং তা আত্মস্থ করে প্রয়োগ করবে। তিনি তাদেরকে ৫ম শিল্পবিপ্লবের জন্য নিজেদের উপযোগী করে তৈরি করারও আহ্বান জানান।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফলতা অর্জনের কথা তুলে ধরে বলেন, গত ১৪ বছরের ধারাবাহিকতায় আমরা শুধু ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়কই তৈরি করিনি, ইন্টারনেটের প্রতি এমবিপিএস'র মূল্য ২৭ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৬০ টাকায় নামিয়ে এনেছি। এক দেশ এক রেট নির্ধারণের মাধ্যমে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করা হয়েছে। ইন্টারনেট এখন মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো। ২০০৮ সালে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহার হতো সাড়ে সাত জিবিপিএস, তা বর্তমানে ৪১ শত জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে। সে সময়ের ৮ লাখ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর স্থলে এখন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১২ কোটিতে।

বাংলাদেশকে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনের হাব-এ রূপান্তরের কাজ হচ্ছে

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনের হাব এবং রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তর করতে কাজ করছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোন শতকরা ৯৫ ভাগ দেশীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ডিজিটাল ডিভাইস আমাদানিকারক থেকে রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তর করা সরকারের ডিজিটাইজেশনের স্বপ্নের অন্যতম একটি লক্ষ্য। মন্ত্রী ২৪শে মে তার দপ্তর থেকে নারায়নগঞ্জের মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোনে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থেকে ট্রান্সশান হোল্ডিংসের মোবাইল ফোন উৎপাদন কারখানা আই স্মার্ট ইউ ফ্যাক্টরি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকারের প্রযুক্তিবান্ধব নীতির ফলে দেশে বিশ্ব মানের ১৫টি মোবাইল কোম্পানি মোবাইল ফোন কারখানা স্থাপন করেছে এবং আরও কয়েকটি কারখানা স্থাপন পাইপ লাইনে

আছে। স্থানীয়ভাবে স্মার্টফোন উৎপাদন কারখানা চালুর জন্য ট্রান্সশান হোল্ডিংসের উদ্যোগের প্রশংসা করে মন্ত্রী বলেন, এটি স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এবং এর মাধ্যমে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' উদ্যোগ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

মন্ত্রী আরও বলেন, দেশে মোবাইল ফোনের অভিযাত্রা ১৯৮৯ সালে সীমিত আকারে শুরু হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে টু-জি, ২০১৩ সালে থ্রি-জি, ২০১৮ সালে ফোর-জি এবং ২০২১ সালে ফাইভ-জি প্রযুক্তি যুগে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেন।

মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন শিল্পে বাংলাদেশের বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ছোটোখাটো কিছু সংকট বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোবাইল ফোন রপ্তানির একটি বড়ো বাজার হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তিনি বলেন, দেশে উৎপাদিত ডিজিটাল যন্ত্রের গুণগতমান নিশ্চিত করার পাশাপাশি গবেষণা ও উন্নয়নের বিষয়ে মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। ২২শে মে এস্তোনিয়ার রাজধানী তাল্লিনে 'পঞ্চম ই-গভর্নেন্স সম্মেলন ২০১৯'-এর দ্বিতীয় দিনে মিনিস্ট্রিয়াল প্যানেল আলোচনায় তিনি এ সব কথা বলেন। সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

প্যানেল আলোচনায় প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুতগতির ইন্টারনেটের যুগে নিজ সোসাইটির ট্রান্সফরমেশন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছেন। এই রূপকল্প বাস্তবায়নে চারটি স্তম্ভ বা পিলার নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়ন, ইন্টারনেটের সংযোগ দেওয়া, ই-গভর্নেন্স এবং তথ্যপ্রযুক্তির শিল্প খাত গড়ে তোলা। এ চারটি মূল লক্ষ্য বা পিলারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশকে দাঁড় করানো হচ্ছে।

আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে আইসিটি খাতে ১০ লাখ জনবলের কর্মসংস্থান হয়েছে, যা আগামী পাঁচ বছরে আরও ১০ লাখে উন্নীত হবে। গত ১০ বছরে আইসিটি খাতে বাংলাদেশে ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, ১০ বছর আগে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশে বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে প্রায় সাড়ে নয় কোটিতে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশে স্টার্টআপ কালচার তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক মানের ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে এগিয়ে বাংলাদেশ

আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। সংখ্যার হিসাবে গত অর্থবছর বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ১ হাজার ১১৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানিতে একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বাজার যুক্তরাষ্ট্র। গত অর্থবছর মোট রপ্তানি আয়ের ২০ শতাংশ এসেছে দেশটি থেকে। জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্যের তুলনায় আমেরিকায় রপ্তানিতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে গত অর্থবছরে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য মতে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ১১৭ কোটি ডলারের পণ্য, যা মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ২২ শতাংশ। গত বছর মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ৫ হাজার ২০৮ কোটি ডলার। পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে জার্মানি। দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৭৫৯ কোটি ডলারের পণ্য, যুক্তরাজ্য থেকে রপ্তানি আয় এসেছে ৪৮৩ কোটি ডলার, ফ্রান্স থেকে ২৭১ কোটি ডলার এবং স্পেন থেকে ৩১৭ কোটি ডলারের রপ্তানি আয় এসেছে। উল্লিখিত চারটি দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ছিল সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ।

২০২১-২০২২ অর্থবছর যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১ হাজার ৪২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যার মধ্যে ৮৬ শতাংশ আয়ই তৈরি পোশাক থেকে, যার পরিমাণ ৯০১ কোটি ডলার। এছাড়া ৩১ কোটি ডলারের হোম টেক্সটাইল রপ্তানি হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের ২১ শতাংশ এবং হোম টেক্সটাইলের ১৭ দশমিক ৮৫ শতাংশের গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য মতে, চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সর্বোচ্চ ৭৯৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাকই ছিল ৬৯৫ কোটি ডলার, যা কিনা বাংলাদেশে মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ১৮ শতাংশের কাছাকাছি।

প্রথমবারের মতো 'জাতীয় চা পুরস্কার' পাচ্ছেন ৮ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, দেশের চা শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় চা পুরস্কার' প্রদান করা হবে। ৮ ক্যাটাগরিতে ৭টি প্রতিষ্ঠান এবং

একটি ব্যক্তি পর্যায়ে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। চা শিল্পের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জাতীয় চা পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী।

যে ৮টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হবে সেগুলো হলো : (১) একর প্রতি সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী চা বাগান; (২) সর্বোচ্চ গুণগত মানসম্পন্ন চা উৎপাদনকারী বাগান; (৩) শ্রেষ্ঠ চা রপ্তানিকারক; (৪) শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারী; (৫) শ্রমিক কল্যাণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ চা বাগান; (৬) বৈচিত্র্যময় চা পণ্য বাজারজাতকরণের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি; (৭) দৃষ্টিনন্দন ও মানসম্পন্ন চা মোড়কের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ চা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি; (৮) শ্রেষ্ঠ চা পাতা চয়নকারী (ব্যক্তি/শ্রমিক)।

জিআই মর্যাদা পাচ্ছে ৭ পণ্য

বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (জিআই) সনদ পাচ্ছে দেশীয় জাতের ছাগল ব্ল্যাক বেঙ্গলসহ ৭টি পণ্য। আগের ১১টিসহ দেশে জিআই মর্যাদা পাওয়া মোট পণ্য হচ্ছে ১৮টি। জিআই সনদ পেতে যাওয়া আরও ৬টি পণ্য হচ্ছে– শীতলপাটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম ও ল্যাংড়া জাতের আম, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, শেরপুরের তুলসীমালা ধান এবং বগুড়ার দই।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

আয়রন লেডি আখ্যা পেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘এশিয়ার লৌহমানবী’ বা ‘আয়রন লেডি’ হিসেবে অভিহিত করেছে যুক্তরাজ্যের সাময়িকী *দ্য ইকোনমিস্ট*। ২৪শে মে এই ম্যাগাজিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারসহ খবর প্রকাশিত হয়। তাতে শেখ হাসিনাকে ‘এশিয়ার লৌহমানবী’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্য ইকোনমিস্ট বলছে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত চারবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন তিনি। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বাংলাদেশের গড় জিডিপি ছিল সাড়ে ৭ শতাংশ। আর বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এটাকেই ‘অভাবনীয়’ বলে উল্লেখ করেছে *দ্য ইকোনমিস্ট*।

শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশের শিল্প, ব্যাবসা, কৃষি ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে। টানা ক্ষমতায় থাকার কারণে তাঁর আমলে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ঐ প্রতিবেদনে। শেখ হাসিনার কর্মজীবন সাহসিকতার বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ম্যাগাজিনের মতে, চারবার সরকার গঠন করে ইন্দিরা গান্ধী এবং মার্গারেট থ্যাচারকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি ওয়াশিংটন সফরের সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেয় *দ্য ইকোনমিস্ট*।

গাজীপুর সিটি পেল প্রথম নারী মেয়র

বাংলাদেশের ইতিহাসে গাজীপুরবাসী এই প্রথম কোনো নারীকে মেয়র হিসেবে পেল। ২৫শে মে অনুষ্ঠিত গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন জায়েদা খাতুন নামের এই নারী। জায়েদা খাতুন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আজমত উল্লাকে ১৬ হাজার ১৯৭ ভোটে হারিয়েছেন। জায়েদা খাতুন ২ লাখ ৩৮ হাজার ৯৩৪ ভোট পেয়েছেন। আর আজমত উল্লা খান পেয়েছেন ২ লাখ ২২ হাজার ৭৩৭ ভোট। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ৪৮০টি কেন্দ্রে বিরতিহীনভাবে চলে ভোটগ্রহণ। উল্লেখ্য, জায়েদা খাতুন হলেন গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মা। জায়েদা খাতুন হলেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের তৃতীয় এবং প্রথম নারী মেয়র।

_ফোর্বস_-এর তালিকায় সাত বাংলাদেশির চারজনই নারী

মার্কিন সাময়িকী *ফোর্বস*-এর প্রকাশিত ২০২২ সালে শীর্ষ এশীয়দের ‘৩০ অনূর্ধ্ব ৩০’ তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন সাত বাংলাদেশি। আর এ সাতজনের মধ্যে চারজনই নারী। ১৮ই মে *ফোর্বস*-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে এ তালিকা। এতে ১০টি ক্যাটাগরিতে ৩০ জন করে মোট ৩০০ তরুণ স্থান পেয়েছেন। তালিকায় স্থান পাওয়া বাংলাদেশের চার নারী হলেন– রুবাইয়াৎ ফারহান, তাসফিয়া তাসবিন, জাহ্নবী রহমান ও সারাবান তহুরা।

এদের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সৃজনশীল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান মার্কোপলো ডটএআই-এর প্রতিষ্ঠাতা রুবাইয়াৎ ফারহান ও তাসফিয়া তাসবিন। তারা দুজন স্থান করে নিয়েছেন মিডিয়া, মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং ক্যাটাগরিতে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং সেবা দিয়ে থাকে মার্কোপলো ডটএআই। ২০২২ সালে কোম্পানিটি ভেনচার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান ‘সিঙ্গাপুর ভিসি’ থেকে সাত লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ পায়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম রিল্যাক্সির সহ-প্রতিষ্ঠাতা জাহ্নবী রহমান। তিনি সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট ক্যাটাগরিতে স্থান করে নিয়েছেন শীর্ষ ৩০ জনের মধ্যে। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বাংলাদেশি তরুণদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সহায়তা দিয়ে থাকে রিল্যাক্সি।

সারাবান তহুরা তালিকায় জায়গা পাওয়া আরেক বাংলাদেশি তরুণ আনওয়ার সায়েফকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন টার্টল ভেঞ্চার স্টুডিও। সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট ক্যাটাগরিতে শীর্ষ ৩০ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন তারা। স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে থাকে টার্টল ভেঞ্চার। প্রতিষ্ঠানটি এরই মধ্যে ৯০টি উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করেছে এবং এদেরকে দেড় কোটি মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে।

প্রতিবছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ সংগঠক, উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকের তালিকা প্রকাশ করে মার্কিন সাময়িকী *ফোর্বস*। এর আগে, ২০১৬ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৯

জন বাংলাদেশি *ফোর্বস*-এর সম্মানজনক এ তালিকায় জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। পরে ২০২১ সালেই ৯ জন বাংলাদেশি তরুণ উঠে যান *ফোর্বস*-এর পাতায়। এবার ২০২২ সালের তালিকায় স্থান হয়েছে আরও সাত বাংলাদেশির।

যুক্তরাজ্যের রেডব্রিজের মেয়র হলেন মৌলভীবাজারের জোৎস্না

যুক্তরাজ্যের লন্ডন বরো অব রেডব্রিজের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের মেয়ে জোৎস্না ইসলাম। ১৯শে মে রেডব্রিজ কাউন্সিলের বার্ষিক মিটিংয়ে তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর আগে ২০২১ সালের ২৯শে এপ্রিল তিনি লন্ডন বরো অব রেডব্রিজের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জোৎস্না ইসলাম ও তার স্বামী সাম ইসলাম একই কাউন্সিলের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি মৌলভীবাজার সদরের একাটুনা ইউনিয়নের আব্দুর রহমান মন্নাফ মিয়ার মেয়ে। ডেপুটি মেয়র জোৎস্না রহমান ইসলাম ১৯৬৬ সালে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পরে মা-বাবার ইচ্ছায় দেশে ফিরে আসেন। মৌলভীবাজারে আলী আমজাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে পড়াশোনা করেন। ১৯৮৬ সালে আবার তিনি লন্ডনে যান। সেখানে লোকাল গভর্নমেন্টে চাকরির পাশাপাশি তিনি এমবিএ করেন। বর্তমানে রেডব্রিজ লেবার পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন জোৎস্না ইসলাম।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন আন্তঃনগর ট্রেন 'চিলাহাটি এক্সপ্রেস'

ঢাকা-চিলাহাটি রুটে নতুন আন্তঃনগর ট্রেন 'চিলাহাটি এক্সপ্রেস' উদ্বোধন করা হয়। ৪ঠা জুন ২০২৩ নীলফামারীর চিলাহাটি রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে হুইসেল বাজিয়ে ও সবুজ পতাকা নেড়ে নতুন এই ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার ছাড়া সপ্তাহে ছয় দিন ট্রেনটি এ রুটে চলাচল করবে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে আওয়ামী লীগ দেশের জনগণকে সেবা দিতে চায় উল্লেখ করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নতুন এই রেলসেবা ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিকভাবে সমৃদ্ধ উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগের পাশাপাশি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আধুনিক ও গতিশীল রেলসেবা নিশ্চিত করতে বর্তমানে আলাদা রেল মন্ত্রণালয় আছে যাতে মানুষ আরও বেশি সুবিধা পায়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্তে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা জুন ২০২৩ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নীলফামারীর চিলাহাটি রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত ঢাকা-চিলাহাটি-ঢাকা রুটে আন্তঃনগর ট্রেন 'চিলাহাটি এক্সপ্রেস' উদ্বোধন করেন –পিআইডি

ড. মো. হুমায়ুন কবির ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া নীলফামারী প্রান্তে অন্যদের মধ্যে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন, নীলফামারী-২ আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যসচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার সঞ্চালনায় গণভবন প্রান্তে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. হুমায়ুন কবীর স্বাগত বক্তব্য ও পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে রেল খাতের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন। রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বলেন, আগামী সেপ্টেম্বরে ঢাকা-কক্সবাজার ও পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা–ভাঙ্গা ট্রেন চলাচল শুরু হবে। পাশাপাশি আগামী জুলাই মাসে মোংলা বন্দরের সঙ্গে খুলনা ও আখাউড়া-আগরতলায় রেললাইন সংযোগ চালু হবে। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ রেলওয়ের ওপর একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

ভারত থেকে রেলের ২০ ইঞ্জিন উপহার পেল বাংলাদেশ

রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন ও ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ২৩শে মে ২০২৩ ভার্চুয়ালি এক অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী ঢাকায় রেল ভবন থেকে ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দুই দেশের রেলমন্ত্রীর এক ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শনা-গেদে বর্ডার দিয়ে ইঞ্জিনগুলো গ্রহণ করা হয়।

ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী ঢাকায় রেল ভবন থেকে এবং ভারতের রেলমন্ত্রী নয়াদিল্লি থেকে যুক্ত হন। এ সময় বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, ভারত ২০টি পুরোনো ব্রডগেজ লোকোমোটিভ উপহার দিয়েছে। ইঞ্জিনগুলো গড়ে আট বছরের পুরোনো। এই ইঞ্জিনগুলো দেশের রেলের বহরে যুক্ত হবে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরের সময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ বিবৃতিতে ভারতীয় রেলওয়ে থেকে ২০টি ইঞ্জিন অনুদান হিসেবে দেওয়ার বিষয়টি আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, যেসব ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে, সেগুলো আধুনিক ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, ৩ হাজার ৩০০ অশ্বক্ষমতাসম্পন্ন। দুই দেশের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ নানা বিষয় সহযোগিতা বিদ্যমান। বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে ২০টি ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে– যা বাংলাদেশের মানুষের রেল ভ্রমণে স্বাচ্ছন্দ্য আনবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

বিনামূল্যে গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি বিতরণের উদ্যোগ

দেশের ৩১টি চরাঞ্চলের ৬৫ হাজার ২৯০ পরিবারে বিনামূল্যে গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বিনামূল্যে এ সব প্রাণীর খাদ্য, ওষুধ এবং ভ্যাকসিনও দেওয়া হবে। এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

এ প্রকল্পের আওতায় ৩২ হাজার ৯০০ পরিবারকে ২৫টি করে মুরগি দেওয়া হবে। এরই সঙ্গে মুরগির ঘর, খাদ্য, ভ্যাকসিন ও ওষুধ দেওয়া হবে। এছাড়া ১৬ হাজার ৪৫০ পরিবারকে ২১টি

করে হাঁস দেওয়া হবে। সঙ্গে দেওয়া হবে হাঁসের ঘর, খাদ্য, ভ্যাকসিন ও ওষুধ। ৮ হাজার ২২০ পরিবারকে দেওয়া হবে দুইটি করে ছাগল। পাশাপাশি দেওয়া হবে ছাগলের ঘর, খাদ্য, ভ্যাকসিন ও ওষুধ। ৪ হাজার ১১০ পরিবার পাবে তিনটি করে ভেড়া। সঙ্গে থাকবে ভেড়ার ঘর, খাবার এবং ওষুধ। ১ হাজার ৬৫০ পরিবার একটি করে পাবে বকনা বাছুর। সঙ্গে খাদ্য, ভ্যাকসিন এবং ওষুধও দেওয়া হবে। এছাড়া ৩৬০ পরিবারকে দেওয়া হবে কবুতর ও কোয়েল পাখি । সঙ্গে দেওয়া হবে বাসস্থান, ভ্যাকসিন ও ওষুধ। প্রকল্পের আওতায় ৩৬০টি ঘাসের প্রদর্শনী প্লট (২০ শতাংশ জায়গায়) দেওয়া হবে এবং ২৪০টি উন্নত জাতের ঘাস দ্বারা সাইলেজ তৈরি প্রদর্শনী করা হবে।

ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরের ৩১টি উপজেলার চরাঞ্চলের মানুষ এ প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এ সব এলাকায় নদী তীরবর্তী ৬৫ হাজার ২৯০টি দরিদ্র পরিবারের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর চর এলাকায় দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি নদী তীরবর্তী এলাকায় ১০টি পশুসম্পদ প্যাকেজ গ্রহণ করা হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন, আমরা এরই মধ্যে চরাঞ্চলে বিনামূল্যে গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগি বিতরণের প্রকল্প হাতে নিয়েছি। পরিকল্পনা কমিশন সবকিছু ঠিক করেছে। আশা করছি, সামনের একনেক সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপন করতে পারব। প্রকল্প এলাকার মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন হবে। প্রাণিসম্পদ নির্ভর জীবিকার উন্নয়ন করা হবে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

তামাক নয়, খাদ্য ফলান

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে ৩১শে মে জাতিসংঘের প্রতিপাদ্য– 'উই নিড ফুড, নট টোব্যাকো' অনুসারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিপাদ্য 'তামাক নয় খাদ্য ফলান' উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, প্রকৃতপক্ষে তামাকের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। আমি সারাজীবন একটিও সিগারেট বা তামাক গ্রহণ করিনি। পৃথিবীতে বহু ক্ষুধার্ত মানুষ আছে। মাদক চাষের চেয়ে তাদের জন্য খাদ্য ফলানো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মাদক চাষের জন্য ব্যবহৃত জমি যদি আমরা খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার করতে পারি তাহলে খাদ্য উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে– দেশ, জাতি, সমাজ, বিশ্ব উপকৃত হবে।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা একটি মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছেন। কোনো পরিবারে যদি কেউ মাদকাসক্ত থাকে সেটি শুধু তাকে নয়, পুরো পরিবারকে ভোগায়। এটি একটি মারাত্মক ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ব্যাধি। এটি থেকে সমাজকে আসলেই মুক্ত রাখা দরকার। এজন্য ব্যাপক ক্যাম্পেইন প্রয়োজন। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানের পাশাপাশি পারিবারিক, সামাজিক ও গণমাধ্যমে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে মানুষকে আরও সচেতন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশকে মাদকমুক্ত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

মাগুরায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সফল উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান

মাগুরায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সফল উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। মাগুরার বেসরকারি সংস্থা অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (এডিআই) শহরের পারনান্দুয়ালী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পল্লীকর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় ২৮শে মে এ সম্মাননার আয়োজন করে।

সম্মাননা প্রাপ্তরা হচ্ছেন– কৃষিতে সদরের শিবরামপুরের ওবাইদুল ইসলাম ও আমুড়িয়ার বাচ্চু মিয়া, মৎস্য চাষে সদরের সৈয়দ রূপাটি গ্রামের সাগর আহমেদ ও শালিখার ধনেশ্বরগাতি গ্রামের উজ্জল লস্কর, প্রাণিসম্পদে আমুড়িয়া গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন ও শালিখার ধনেশ্বরগাতি গ্রামের সোনালী বিশ্বাস।

আম রপ্তানির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

চলতি বছর আম রপ্তানি কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা চার হাজার টন, যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। ২৫শে মে ঢাকার শ্যামপুরে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে আম রপ্তানির উদ্বোধন করেন কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার। রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প এবং বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস অ্যান্ড এলাইড প্রোডাক্ট এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের ২৮টি দেশে এক হাজার ৭৫৭ মেট্রিক টন আম রপ্তানি করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে কৃষিসচিব বলেন, সারা বিশ্বেই বাংলাদেশের আমের

সুনাম রয়েছে। দেশে ২৪ লাখ টনের ওপরে আম উৎপাদন হয়। গত বছর মাত্র এক হাজার ৭৫৭ মেট্রিক টন রপ্তানি করা হয়েছে। বিশ্বে আম উৎপাদনে আমরা সপ্তম স্থানে। রপ্তানি আরও বৃদ্ধি করতে হবে। রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ২০২২ থেকে ২০২৭ খ্রি. মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৭ কোটি টাকা। রপ্তানিযোগ্য মানসম্মত আম উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের ১৫টি জেলার ৪৬টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকল্প সহায়তায় উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে আম উৎপাদন প্রদর্শনী ৩৫০টি, রপ্তানিযোগ্য জাতের আম বাগান সৃজন ৬০৪টি, বিদ্যমান আম বাগানে সার ও বালাই ব্যবস্থাপনা ২৪০টি এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার (প্রুনিং, ব্যাগিং ও বালাই ব্যবস্থাপনা) মানসম্মত ২০০টি আম উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯টি উপজেলাতে ৩৭১ জন আম চাষিকে ক্লাস্টার প্রদর্শনীর আওতায় আনা হয়েছে। মানসম্মত আম উৎপাদন ও পোস্ট হার্ভেস্ট ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে কৃষক গ্রুপে হাইড্রোলিক ম্যাংগো হারভেস্টার, গার্ডেন টিলার, ফুট পাম্প, এলএলপি ও ফিতাপাইপ সেট সরবরাহ করা হয়েছে।

১৫০ জন কৃষক পেলেন ধান বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ১৮ই মে জেলার কোটালীপাড়ায় ১৫০ জন কৃষক বিনামূল্যে পেলেন কৃষি যন্ত্রপাতি ও ধান বীজ। কোটালীপাড়া পৌরসভা মিলনায়তনে কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষকলীগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শরীফ আশরাফ আলী।

কোটালীপাড়া কৃষক লীগের সভাপতি মুন্সী মাহফুজ হাসানাত কামরুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন কোটালীপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আয়নাল হোসেন শেখ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন গোপালগঞ্জ জেলা কৃষক লীগের সভাপতি শেখ লুৎফর রহমান গঞ্জুর, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও কোটালীপাড়া পৌরসভার মেয়র মতিয়ার রহমান হাজরা। পরে ১৫০ জন কৃষকের মধ্যে চারটি সেচ পাম্প, ৩০টি জমি নিড়ানি মেশিন, ১৬টি স্প্রে মেশিন ও ২০০ কেজি হাইব্রিড বীজ ধান বিতরণ করা হয়।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

বিপদাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে রেড লিস্ট প্রণয়ন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, বর্তমান সরকার দেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো ১০০০টি উদ্ভিদের তালিকা প্রস্তুত করেছে যার মাধ্য ৩৯৪ প্রজাতি সংকটাপন্ন। গবেষণালব্ধ এ ফলাফল বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং বিপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সুরক্ষায় জাতীয় নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ১৪ই মে বন অধিদপ্তরে আয়োজিত 'ফাইনাল ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপ অন ন্যাশনাল রেড লিস্ট অব প্লান্টস' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, লাল তালিকা মূল্যায়নের ফলাফল অনুযায়ী ১০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে ৮টি প্রাথমিকভাবে বিলুপ্ত, ৫টি মহাবিপন্ন, ১২৭টি বিপদাপন্ন, ২৬২টি সংকটাপন্ন, ৬৯টি প্রায় সংকটাপন্ন, ২৭১টি ন্যূনতম উদ্বেগজনক এবং ২৫৮টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার ২২শে মে ঢাকায় 'আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস-২০২৩' উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিতে অংশ নেন –পিআইডি

তথ্যের ঘাটতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি দেশের বিলুপ্তির উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা মহাবিপন্ন বাঁশপাতা, ট্রায়াস অর্কিড, চালমুগড়া, বামন খেজুর উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ সংরক্ষণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং অন্যান্য বিপন্ন উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষায়ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন আরও বলেন, এ দেশের বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফলাফলে প্রাপ্ত সংকটাপন্ন উদ্ভিদগুলোকে বনায়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, এই ধরনের প্রজাতির পূর্ণ তথ্য জানার জন্য দেশের অবশিষ্ট প্রায় ৩০০০ উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। সংকটাপন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির সুরক্ষার জন্য বিদ্যমান আইন ও প্রবিধান মালার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

ভূমিকম্প দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেন, ভূমিকম্প দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেন। ১০ই মে রাজধানীর পূর্ত ভবনের সম্মেলন কক্ষে তুরস্কে সংগঠিত ভূমিকম্প থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে 'ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে করণীয়, বিএনবিসির প্রয়োগ এবং স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার নিরাপদ নগরী গঠনের লক্ষ্যে ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণপূর্ত অধিদপ্তর ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে Retrofitting প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে, প্রয়োজনীয় কারিগরি ম্যানুয়েল প্রণয়ন করেছে এবং বিভিন্ন স্তরের প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

ভূমিকম্প দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মেনে চলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি এবং টর্নেডোর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি বাংলাদেশ উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। প্রতি ১০০-১৫০ বছরের ইতিহাসে দেশ বড়ো ধরনের ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ১৮৯৭ সালের গ্রেট আসাম ভূমিকম্পসহ অনেক বড়ো ভূমিকম্পের সম্মুখীন হয়েছে। কোনো ধরনের পূর্বাভাস ছাড়া ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকে বলে বড়ো মাত্রায় যে-কোনো ভূমিকম্প ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে। তাই এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো ভবনগুলোকে BNBC অনুযায়ী ভূমিকম্প সহনীয় ডিজাইন করে শক্তিশালী করা। নতুন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে Seismic Design পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। পুরোনো দুর্বল ভবনের ক্ষেত্রে যথাযথ Seismic Retrofitting করা উচিত।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র *মাইক*

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে উপজীব্য করে সরকারি অনুদানে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র *মাইক* সিনেমাটি ২৯শে মে আনকাট সেন্সর ছাড়পত্র পেয়েছে।

এফ এম শাহীনের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন এফ এম শাহীন ও হাসান জাফরুল বিপুল।

মাইক চলচ্চিত্রে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন ফেরদৌস আহমেদ ও তানভীন সুইটি। এ ছাড়াও অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান, নাদের চৌধুরী, ঝুনা চৌধুরী, জয়িতা মহলানবিশ ও শিশুশিল্পী সানজিদ রহমান খানসহ আরও অনেকে।

মাইক-এর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণসহ স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে পারবে। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে চলচ্চিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় কবির ১২৪তম জন্মবার্ষিকী

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মবার্ষিকী ছিল ২৫শে মে ২০২৩ (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০)। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম এই প্রাণপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 'বিদ্রোহী কবি', 'প্রেমের কবি', 'সাম্যের কবি'সহ নানা অভিধা।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম 'দুখু মিয়া'। তিনি অবিভক্ত বাংলার (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ) বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৯ সালের ২৫শে মে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহমেদ ও মায়ের নাম জাহেদা খাতুন।

কবির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। এ বছর জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য– 'অগ্নিবীণার শতবর্ষ: বঙ্গবন্ধুর চেতনায় শানিতরূপ।'

কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কঠিন শাসন কবির বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে পারেনি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে নজরুলের কবিতা ও গান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, নজরুলের সাহিত্যকর্মে পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। অসামান্য ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবোধের মূর্ত প্রতীক।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, মানবতা, সাম্য ও দ্রোহের কবি নজরুলের আজীবন সাধনা ছিল সমাজের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি এবং মানুষের সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি অর্জন। তিনি অন্যায়, অসত্য, নির্যাতন-নিপীড়ন, নানামাত্রিক অসাম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে যুগে যুগে প্রতিবাদ প্রতিরোধের অনাবিল প্রেরণা জুগিয়েছেন।

জাতীয়ভাবে এবার জন্মবার্ষিকীর আয়োজন করা হয় কবির স্মৃতিধন্য ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুরে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কবির জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। তিন দিনব্যাপী (২৫শে মে থেকে ২৭শে মে) উদ্বোধন দিনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী।

১৯৭২ সালের ২৪শে মে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনে তাঁকে ঢাকায় এনে জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কবির 'চল্ চল্ চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'কে রণসংগীত হিসেবে নির্বাচিত করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট তৎকালীন পিজি (বর্তমানে বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। মৃত্যুর পর কবির ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন গানের বুলবুল কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

প্রতিবেদনঃ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের সিরিজ জয়

চেমসফোর্ডে ১৪ই মে এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৫ রানে হারালো বাংলাদেশ। স্নায়ুক্ষয়ী এ জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ নিশ্চিত করল তামিম ইকবালের দল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৮.৫ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ২৭৪ রান করে বাংলাদেশ। জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে আইরিশরা ৯ উইকেটে ২৬৯ রান তুলতে সমর্থ হয়। ফলে ৫ রানের জয় পায় বাংলাদেশ।

১৪ বছর পর চ্যাম্পিয়ন মোহামেডান

৩০শে মে কুমিল্লার ভাষা শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন কাপের ফাইনালে টাইব্রেকারে ঢাকা আবাহনীকে ৪-২ গোলে হারিয়ে এক যুগেরও বেশি সময় পর শিরোপা উৎসব করল মোহামেডান। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা ৪-৪ গোলে ড্র ছিল। ম্যাচে হ্যাটট্রিকসহ একাই চার গোল করেন মোহামেডানের সোলেমান দিয়াবাতে।

১৪ বছর আগে ২০০৯ ফেডারেশন কাপের ফাইনালে টাইব্রেকারে আবাহনীকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল মোহামেডান। এবারও তাই। তবে ভেন্যু এবং গোল সংখ্যায় কিছুটা পার্থক্য। সেবার আবাহনীকে টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা উল্লাস করেছিল তারা। এবার হারালো ৪-২ গোলে।

ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু আইএইচএফ চ্যালেঞ্জ ট্রফিতে মেয়েদের হ্যান্ডবলের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ১৭ই মে শহিদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী জাতীয় হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা ৪৬-৪৩ গোলে ভারতকে হারায়। জাতীয় ও বয়সভিত্তিক কোনো পর্যায়েই কখনোই এর আগে ভারতকে হারাতে পারেনি বাংলাদেশ। সাউথ-সেন্ট্রাল এশিয়া জোন-২-এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশ ইয়ুথ দল খেলবে এই টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে।

রেকর্ড ২২ বার চ্যাম্পিয়ন আবাহনী

মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ১৩ই মে লিগের শেষদিনে অঘোষিত ফাইনালে রূপ নেওয়া ম্যাচে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শেখ জামাল ৭ উইকেটে ২৮২ রান করে। আবাহনী জবাব দেয় ৬ উইকেটে ২৮৫ রান করে। তানজিমের শেষ ছোঁয়ায় চার বল বাকি থাকতে চার উইকেটে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবকে হারিয়ে ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগের শিরোপা জিতল আবাহনী। এ নিয়ে রেকর্ড ২২ বার ঢাকা লিগে চ্যাম্পিয়ন হলো তারা।

বাংলাদেশের সেরা তামিম ও সাকিব

২০২০-২০২৩ চক্রে বাংলাদেশের সেরা ব্যাটার তামিম ইকবাল। আইসিসি ওয়ানডে সুপার লিগের এই চক্রে ইতোমধ্যেই নিজেদের ২৪ ম্যাচের সবকটি খেলে ফেলেছে বাংলাদেশ। সব ম্যাচেই খেলেছেন তামিম। এ সময় ২৪ ম্যাচে প্রায় ৩৪ গড়ে ৭৮৩ রান করেছেন বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়ক, যা বাংলাদেশ দলের কোনো ব্যাটারের সর্বোচ্চ। আর সব দেশ মিলিয়ে এই চক্রে সেরা ব্যাটারদের তালিকায় তামিমের অবস্থান ৭ নম্বরে। এ সময় একটি সেঞ্চুরি ও ছয়টি হাফ সেঞ্চুরিও এসেছে তামিমের ব্যাট থেকে। হাফ সেঞ্চুরির হিসাবেও বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে সবার উপরে রয়েছেন তিনি। ১৭ই মে এটি প্রকাশ করেছে আইসিসি। বোলিংয়ের শীর্ষ দশে আছেন বাংলাদেশের দুজন। ৩১ উইকেট নিয়ে সুপার লিগে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বোলার সাকিব আল হাসান। ৯ নম্বরে মেহেদী হাসান মিরাজ, ২৩ ম্যাচে তিনি নিয়েছেন ৩০ উইকেট।

প্রতিবেদনঃ মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন কালজয়ী চিত্রনায়ক ফারুক

আফরোজা রুমা

বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা-১৭ আসনের সংসদ সদস্য ও চিত্রনায়ক আকবর হোসেন পাঠান দুলু ওরফে ফারুক চলে গেলেন না ফেরার দেশে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই তিনি ১৫ই মে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

আকবর হোসেন পাঠান দুলু ওরফে ফারুক ১৯৪৮ সালের ১৮ই আগস্ট গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব-কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছে পুরান ঢাকায়। বাবা আজগার হোসেন পাঠান। পাঁচ বোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোটো।

১৯৭১ সালে এইচ আকবর পরিচালিত *জলছবি* চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে। তিনি ১৯৭৩ সালে খান আতাউর রহমান পরিচালিত *আবার তোরা মানুষ হ* ও ১৯৭৪ সালে নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত *আলোর মিছিল* দুটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত *সুজন সখী* ও *লাঠিয়াল* চলচ্চিত্র দুটি ব্যাবসা সফল ও আলোচিত হয়। *লাঠিয়াল* চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। পরের বছর ১৯৭৬ সালে মুক্তি পায় তাঁর অভিনীত তিনটি চলচ্চিত্র *সূর্যগ্রহণ*, *মাটির মায়া* ও *নয়নমণি*। এ তিনটি চলচ্চিত্র বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। ১৯৭৮ সালে শহীদুল্লাহ কায়সার রচিত কালজয়ী উপন্যাস *সারেং বৌ* অবলম্বনে নির্মিত *সারেং বৌ* ও আমজাদ হোসেন পরিচালিত *গোলাপী এখন ট্রেনে* চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। চলচ্চিত্র দুটি নারীকেন্দ্রিক হলেও ফারুকের অভিনয় সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৭৯ সালে তাঁর অভিনীত *দিন যায় কথা থাকে*, *নাগরদোলা*, *কথা দিলাম*, *মাটির পুতুল*, *সাহেব*, *ছোট মা*, *এতিম*, *ঘর জামাই* চলচ্চিত্রগুলো ব্যাবসা সফল হয়। ১৯৮০ সালে *সখী তুমি কার* চলচ্চিত্রে শাবানার বিপরীতে শহুরে ধনী যুবকের চরিত্রে অভিনয় করে সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৯০ সালে *মিয়া ভাই* চলচ্চিত্রে সাফল্যের পর তিনি চলচ্চিত্রাঙ্গনে *মিয়া ভাই* হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

অভিনেতা ফারুক অভিনীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে– *ঝিনুকমালা*, *নদের চাঁদ*, *জনতা এক্সপ্রেস*, *এতিম*, *তৃষা*। চলচ্চিত্রের বাইরে ফারুক একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি গাজীপুরে অবস্থিত নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠান 'ফারুক নিটিং ডাইং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং' কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন।

স্কুলজীবন থেকেই অভিনেতা ফারুক আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি ছয় দফা আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ফারুক ২০১৮ সালে বাংলাদেশের একাদশ সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ সংসদীয় আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সালে নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত বিখ্যাত *লাঠিয়াল* চলচ্চিত্রে অভিনয় করার কারণে পার্শ্বচরিত্র ক্যাটাগরিতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান নায়ক ফারুক। ২০০৬ সালে চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে আজীবন সম্মাননা পান তিনি। চিত্রনায়ক ফারুক চলচ্চিত্রে সামগ্রিক অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা পান ২০১৬ সালে। তাছাড়া চিত্রনায়ক ফারুক বেসরকারি আরও অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

কালজয়ী চিত্রনায়ক ফারুকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, 'চিত্রনায়ক ফারুকের মৃত্যু দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্র দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। চলচ্চিত্র অঙ্গনে তাঁর অবদান দেশের মানুষ আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।' অন্যদিকে, সংসদ সদস্য ও চিত্রনায়ক ফারুকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ দেশের চলচ্চিত্রে নায়ক ফারুক এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতি ও সংস্কৃতি অঙ্গনে তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

বাংলা চলচ্চিত্রের 'মিয়া ভাই' খ্যাত চিত্রনায়ক ও সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেন পাঠান ফারুককে ফুলেল শ্রদ্ধা ভালোবাসায় বিদায় জানিয়েছেন সর্বস্তরের মানুষ। ১৬ই মে কেন্দ্রীয় শহিদমিনার ও এফডিসিতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। লাশ গ্রামের বাড়ি গাজীপুরের কালীগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে বাবার কবরের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা পাঠাতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 12, June 2023, Tk. 25.00

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৫ই জুন ২০২৩ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা' এবং 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন ২০২২, জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০২১ প্রদান করেন। এ সময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন এবং উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd